ম্যেলডুনের
সমুদ্রযাত্রা

ম্যেলড়ুনের সমুদ্রযাত্রা

সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ভারত বুক এজেন্সি
২০৬ বিধান সরণি, কলিকাতা-৭০০০০৬

MYELDUNER SAMUDRAJATRA
—SURENDRANATH SENGUPTA

প্রকাশ করেছেন
ভারত বুক এজেন্সির পক্ষে
শ্রী মোহিত বসু
২০৬ বিধান সরণি, কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য : বারো টাকা
(রঙীন চিত্রসহ)

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩

অলংকরন :
শ্রীবিজয় মণ্ডল

গ্রন্থস্বত্ব : অদিতি গুপ্ত
বিবেকানন্দ সেনগুপ্ত
সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত

প্রকাশিত ও প্রকাশের অপেক্ষায়
এই লেখকের অন্যান্য বই :
গল্পে চিত্তরঞ্জন (চতুর্থ সংস্করণ)
আঁধার শেষে আলোর দেশে (দ্বিতীয় সংস্করণ)
টিমটিম ডিমডিম (যুক্তাক্ষরবর্জিত উপন্যাস)
নাম গোপনের ইতিহাস (গল্প সংকলন)
সবারে বাসিব ভালো (গল্প সংকলন)
মিলন (নাটক)
সুধার ধারা (সঙ্গীতাঞ্জলি)
কালুবাবু দি পোয়েট (গল্প সংকলন)

ছেপেছেন :
শ্রীমদন প্রধান
সারদামাতা প্রেস
১৬, সিমলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

কয়েকটি কথা

আমার পিতৃদেব প্রয়াত সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত শিশু ও কিশোরদের জন্য বহু কবিতা, গল্প ও দু'টি উপন্যাস লিখেছেন। বেশ কয়েকটি বিদেশী গল্প ও রূপকথার অনুবাদও তিনি করেছিলেন। 'পঞ্চাশ বছরের সাহিত্য সমীক্ষা' (সম্পাদনা—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ও সোমেশচন্দ্র নন্দী) পুস্তকে পিতৃদেব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: "সুরেনবাবু ছিলেন শিশুসাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক"। ১৩৪৭ সালে দেশবন্ধুর একান্ত সচিব প্রয়াত ললিতমোহন সেনগুপ্ত'র সহযোগিতায় পিতৃদেব লিখিত 'গল্পে চিত্তরঞ্জন' বইটি ছাপা হয়েছিল। এইটিই তাঁর লেখা প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। আমার যতটা মনে পড়ে, ১৩৪৫-৪৮ সালে পিতৃদেবের লেখা বহু গল্প (যুক্তাক্ষরবর্জিত গল্প সহ), 'রাতের আঁধার শেষে ভোরের আলোর দেশে' নামে একটি ছোট শিশু উপন্যাস, 'টিমটিম ডিমডিম' নামে একটি যুক্তাক্ষরবর্জিত উপন্যাস, কবিতা ও অনূদিত বিদেশী গল্প ও রূপকথা প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক প্রয়াত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত 'কৈশোরক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময় প্রায় প্রতিমাসেই 'কৈশোরক' পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপা হ'ত। এছাড়া 'শিশুসাথী' 'মাসপয়লা' 'কৈশোরিকা' প্রভৃতি শিশু ও কিশোর মাসিক পত্রিকায়ও পিতৃদেবের লেখা ছাপা হয়েছে।

আজ থেকে বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বছর পূর্বে লিখিত এই সব গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও অনূদিত বিদেশী গল্প ও রূপকথাগুলি বর্তমান যুগের শিশু ও কিশোরদের কতটা উপযোগী এবং শিশু ও কিশোর-সাহিত্য হিসাবে এসবের সাহিত্যমূল্যই বা কতটুকু তা' বিচারের দায়িত্ব পাঠক ও সাহিত্য-সমালোচকদের। আমার কাজ এই সব লেখা সংগ্রহ ক'রে প্রকাশের ব্যবস্থা করা। আমি সেই চেষ্টাই করছি। আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক করে তোলার কাজে সহযোগিতার জন্য 'ভারত বুক এজেন্সি'র বন্ধুবর শ্রীমোহিতকুমার বসুর নিকট আমি কৃতজ্ঞ। তাঁরই উদ্যোগে 'ম্যেলডুনের সমুদ্রযাত্রা' নামে এই বিদেশী গল্প ও রূপকথার অনুবাদ-সংকলনটির প্রকাশ সম্ভব হল। এ বইটি ছাপার ব্যাপারে সাহিত্য-সমালোচক শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ প্রভূত সাহায্য করেছেন। আমি তাঁরও কাছে কৃতজ্ঞ।

১৫ই আগষ্ট, ১৯৮৩॥ কালিপদ সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

ম্যেলডুনের সমুদ্র যাত্রা

ফিন দ্বীপে বাস করত এক বীর সর্দার। নাম তার ম্যেলডুন।

সিংহের মত তার সাহস, বাঘের মত সে হিংস্র,—যুদ্ধ ছাড়া তার মুখে কথা নেই। ক্ষমা, শান্তি বা অহিংসা এসব তার কাছে ঘৃণার জিনিস। কি করে শত্রুর উপর প্রতিশোধ নেব তাই ছিল তার চিন্তা।

ফিন দ্বীপের কিছু দূরেই ছিল আর একটি দ্বীপ। এই দ্বীপটির সর্দার ম্যাজলিন ম্যেলডুনের ঘোর শত্রু। শুধু আজই নয়, বহুদিন থেকে বংশানুক্রমে এই দুই দ্বীপের শত্রুতা চলে আসছে।

ম্যেলডুনের যে দিন জন্ম ঠিক সেই দিনই তার বাবা ম্যাজলিনের বাবার হাতে নিহত হন। অবশ্য এর কয়েক বছর আগেই আবার ম্যেলডুনের ঠাকুর্দা ম্যাজলিনের ঠাকুর্দাকে হত্যা করেন।

ম্যেলডুন মনে মনে গুমরে বলে—এর প্রতিশোধ চাই!

শত্রুও আস্ফালন করে—এর প্রতিশোধ চাই। কেউ কম যায়না।

ম্যেলডুনের যখন বয়স হ'ল আর সে হয়ে উঠল খুবই ক্ষমতাশালী, তখন সে স্থির করল যে শত্রুর বংশে বাতি দিতে কাউকে সে রাখবে না। সে বেছে বেছে এমন পঞ্চাশ জন লোক সংগ্রহ করল, যারা ঠিক তার মতই সাহসী, হিংস্র, নির্দয় আর প্রতিহিংসাপরায়ণ। তারপর যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম আর ঐ পঞ্চাশ জন লোক নিয়ে সে একদিন ভাসিয়ে দিল তার যুদ্ধ-জাহাজ শত্রু-দ্বীপের দিকে।

শত্রু তীরেই দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখতে পেয়েই ম্যেলডুনের লোকজন রক্ত-পিপাসায় চিৎকার করে উঠল। তারা কল্পনায় অনুভব করতে লাগল, তাদের আঙ্গুলগুলি যেন শত্রুর গলা টিপে ধরেছে। তাদের যেন আর তীরে পৌঁছবারও তর সইছিল না। সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে

প'ড়ে সাঁতার কেটেই তীরে উঠবার জন্য পাগল হয়ে উঠল তারা। এমন সময় ঝড় উঠল। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে—সমুদ্রের জল তোলপাড় ক'রে সেকি ভীষণ ঝড়! নিজেরা ঝাঁপিয়ে পড়বে কি, জাহাজখানাকেই তারা সামলাতে পারল না। ঝড়ের প্রবল বেগ জাহাজটাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল তার আপন খেয়ালে। কোন্ দিকে, কোন্ অজানার মাঝে তারা চলেছে, ম্যেলডুন বা তার লোকজন কেউই কিছু ঠিক করতে পারল না। ঝড় থেমে গেল। মাথার উপর চারিদিকে শুধু নীলাকাশ—নীচে যতদূর চোখ যায়, চারিদিকে সীমাহীন সাগরের নীল জল আকাশছোঁয়া ঢেউ তুলে নাচতে নাচতে চলেছে। সাগরের দিকে তাকালে মনে হয়না যে কোথাও কোনকালে মাটির পৃথিবী ছিল বা এখনও আছে।

সারা দিন সূর্য কিরণে সাগর-বারি ঝিকমিক করে, রাত্রি বেলায় আকাশে বসে তারার মেলা—মাঝে মাঝে চাঁদও ওঠে। নিকটে দূরে বিরাটকায় সামুদ্রিক জীবগুলি ক্ষণে ক্ষণে জলের বুকে মাথা তুলে ছোট জাহাজখানির দিকে ক্ষণেক তাকিয়ে থাকে। তারপর আবার অথৈ জলের অতল তলে কোথায় মিলিয়ে যায়। কি ভীষণ এক একটা জীব! কি ভয়ঙ্কর তাদের চাউনি! বিরাট তাদের 'হাঁ'। কি জোরালো তাদের লেজের ঝাপটা! যে কোন মুহূর্তে ওরা লেজের ঝাপটা মেরে জাহাজসুদ্ধ মানুষগুলোকে একেবারে চুরমার করে দিতে পারে—গিলেও ফেলতে পারে। এমনি করে অসংখ্য বিপদ আর সীমাহীন অথৈপাথার জলের মাঝে ম্যেলডুনের জাহাজ চলেছে নিশানাহীন। কবে, কোথায় মিলবে যে তীরের দেখা তা তারা জানে না। আশঙ্কা, আতঙ্ক আর ভয়ে ম্যেলডুনের লোকজন দিশেহারা—একে অন্যকে তারা এখন তিক্ত ভাষায় গালাগাল দেয়—ক্রোধে ধেয়ে যায় মারতে। হতাশায় ভগবানকে পর্যন্ত তারা অভিশাপ দিতে চায়।

এমনি যখন তাদের অবস্থা, তখন একদিন দূরে দেখা গেল

তীরের রেখা। তীর দেখে প্রাণে তাদের আনন্দ ফিরে আসে,—মুখে ফোটে হাসি। তারা পুরোদমে চালিয়ে দেয় জাহাজ তীরের দিকে। জাহাজ এসে তীরে লাগে। হৈহুল্লোড় করতে করতে গিয়ে তীরে ওঠে তারা। যেখানে গিয়ে তারা উঠল, সেটিও একটি দ্বীপ—নীরবতার দ্বীপ। সেখানকার পশুরা গর্জন করে না, পাখীরা করে না গান—বাতাস নীরবেই বয়ে যায় গাছগুলোকে আর তার পাতাগুলোকে নাড়িয়ে দিয়ে। নদী বয়ে যায়, তার বুকে জাগে না কুলুধ্বনি—সাগরের ঢেউ এসে তটে ভেঙ্গে পড়ে, তাও নীরবে।

ম্যোলডুন ও তার পঞ্চাশজন অনুচর যেমনি তীরে পা দিয়েছে, অমনি কেমন একটা কনকনে হাওয়া তাদের পায়ের ভিতর দিয়ে উঠে, সমস্ত গায়ে ছড়িয়ে প'ড়ে মাথার মধ্যে ঢুকে গেল। আর সাথে সাথেই তাদের মনের আনন্দ, মুখের হাসি, কণ্ঠের ভাষা ভোজবাজীর মত মিলিয়ে গেল। তারা কথা বলতে চায়—বলতে পারে না, হাসতে যায় তাও পারে না,—এমনি কতক্ষণ থাকা যায়! তারা পাগল হয়ে ওঠে। চোখে তাদের ফুঠে ওঠে পরস্পরের প্রতি হিংসা। ওদের চোখের দিকে চেয়ে ম্যোলডুনের বুঝতে দেরী হয়না যে, আর কিছুক্ষণ এমনিভাবে থাকতে হলে ওরা নিজেরাই কামড়া-কামড়ি আরম্ভ করবে। সে আর দেরি না ক'রে তখনই অনুচরদের নিয়ে আবার জাহাজ ভাসিয়ে দেয় সাগরের বুকে। আবার জাহাজ চলতে থাকে—দিশেহারা। কয়েকদিন চলার পর আবার তারা দেখতে পায় পৃথিবীর মাটি। এও একটা দ্বীপ। এখানে আবার সব উল্টো,—শুধু হৈচৈ।

পাখীরা মানুষের ভাষায় গান করছে, বাতাস বিড় বিড় করে মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে বয়ে চলেছে। সাগরের বুকের ঢেউগুলির সে কি গর্জন আর মাতামাতি! মেঘদলের বজ্রধ্বনির যেন বিরাম নেই—আকাশটাকেই তা ফাটিয়ে দেয় বুঝি! এই দ্বীপে পা দিতেই হঠাৎ ম্যোলডুনের একজন অনুচরের মাথায় খুন চেপে বসল। পশুর মত

গর্জন ক'রে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার সাথীদের উপর, আর চোখের পলকে পাঁচটা লোককে সে মেরেই ফেলল একেবারে। দেখে শুনে ম্যেলডুনের তো চক্ষুস্থির। সে তাড়াতাড়ি বাকী পঁয়তাল্লিশজন অনুচরকে নিয়ে আবার গিয়ে উঠল জাহাজে। যারা মরে পড়ে রইল, তাদের দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। কি জানি শেষে আর সব লোকও যদি অমনি ক্ষেপে যায়।

কোন্ সমুদ্রের কোন্ গভীরতম প্রদেশে জাহাজ তাদের নিয়ে চলেছে, তারা জানে না। এই অনিশ্চয়তার মাঝেও তবু মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়ে তারা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু বিপদের শেষ নেই। তালগাছের মত উঁচু উঁচু ঢেউগুলি গর্জন করতে করতে আর নাচতে নাচতে এসে ভেঙ্গে পড়ে জাহাজের উপর। মনে হয় এখনি বুঝি তলিয়ে নিয়ে যাবে সাগরের অতল তলে ; থেকে থেকে ধেয়ে আসে ঝড়ো হাওয়া, দৈত্যের মত বিকট চিৎকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে—মনে হয় এই বুঝি খান খান হয়ে গেল জাহাজখানা। ভীষণ প্রকৃতির সাথে এমনি লড়াই করতে করতে অবশেষে তারা গিয়ে পৌঁছোল আর এক দ্বীপে।

এই দ্বীপটা আবার আরও মজার। এখানে না আছে গাছপালা, না আছে গাছের পাতা ; না আছে মাটি, পাহাড়, নদ, নদী—না আছে কোন প্রাণী। যে দিকে চোখ ফেরাও—কেবল ফুল আর ফুল—লাল, নীল, সাদা, কালো, হলদে—আরও কতরকম। এমন সুন্দর ফুলের দেশে এসে প্রথমটা সবায়ের আনন্দই হোলো। তারা কেউ কেউ ফুলগুলির পাপড়িতে চুমু খেতে লাগল,—কেউ কেউ ফুলের মুকুট করে পরল মাথায়। কেউ কেউ আবার ফুলের পাপড়ি দিয়ে সাজল ফুলসাজে,—কেউ কেউবা আবার ফুলের শয্যা রচনা করে শুয়ে পড়ল। অবশেষে ফুল তুলে তারা খেতে লাগল, আর এ ওর গায়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল।

কিছু সময় বেশ আনন্দেই কাটল তাদের। কিন্তু যতই সময় যেতে লাগল, ততই ফুলের উজ্জ্বল রঙ আর চড়া গন্ধ তাদের আবার পাগল করে তুলল। একঘেঁয়ে ভাব আর সহ্য করতে না পেরে অনুচরদের দু'জন দেখতে না দেখতে কোষ থেকে তাদের তলোয়ার বের করে। ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারার আগেই আটজন লোকের মাথা কেটে ফেলল এরা পরপর। নিজেরাও যুদ্ধ করে কেটে ফেলল একে অপরের মাথা। এখন বাকী রইল আর পঁয়ত্রিশজন অনুচর আর ম্যেলডুন নিজে। কাজেই আবার তারা জাহাজ ভাসিয়ে দিল সাগর জলে। এবার যে দ্বীপে এসে পৌঁছোল জাহাজ—সেটা হ'ল ফলের দ্বীপ। আম, জাম, নারিকেল; আতা, পেঁপে, আনারস; আঙ্গুর, নেসপাতি, কমলালেবু—মানে, পৃথিবীর সকল দেশের, সকল সময়ের সব রকমের ফল।

এখানকার মাটিতে আছে সকল দেশের সব রকমের মাটির গুণ। আর এর আবহাওয়ায় মিশে আছে সব দেশের সব সময়ের সব রকমের আবহাওয়া। পঁয়ত্রিশজন অনুচর, যার যে ফল খুসী খেয়ে নিল পেট ভরে। ম্যেলডুন কিন্তু দু'একটা ফল মুখে দিতেই বুঝতে পারল যে ফলগুলি মিষ্টি বটে কিন্তু বেশী খেলে নেশা হবে। তাই সে আর খেল না। অনুচরদেরও নিষেধ করল খেতে। ম্যেলডুন নিষেধ করবার আগেই তারা অনেক খেয়েছে—মেতে উঠেছে নেশায়। তখন কি আর তাদের ম্যেলডুনের নিষেধ শোনবার মত মনের অবস্থা আছে; না মাথার ঠিক আছে। চোখে তখন তাদের স্বপ্নের ঘোর। তারা তখন দেখছে যে এক একটা ফল যেন বেশ বড় বড় পাথরের নুড়ি—এত বড় যে ছুঁড়ে মারলে এক একটাতেই লোকের দফা রফা হতে পারে। কতকগুলি ফল আবার কেমন টকটকে লাল! ঠিক মানুষেরই রক্তের মত! ঐ লাল ফলগুলি ছুঁড়ে মেরে মানুষের লালরক্ত বের করতে কি মজা! রক্তের নেশায় এবার তারা

পাগল হয়ে ওঠে। একে অপরের দিকে চেয়ে হাসতে থাকে ক্রূর হাসি —ভুলে যায় ওরা একই দলের লোক, কেউ কারো শত্রু নয়। এই যখন ওদের মনের অবস্থা, এর পরে যে কি ঘটল তাতো বুঝতেই পারো। একে অপরকে শত্রু ভেবে প্রত্যেকেই বড় বড় আর ভারী ভারী ফল নিয়ে গায়ের জোরে ছুঁড়তে লাগল পরস্পরকে তাক ক'রে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বেধে গেল ভীষণ যুদ্ধ। এখন আর শুধু ফল ছোঁড়াছুঁড়ি নয়—অসিতে অসিতে আরম্ভ হয়ে গেল খাঁটি যুদ্ধ।

কাটা গেল আরও পাঁচ জনের মাথা। বাকী ত্রিশ জনকে অনেক কষ্টে থামিয়ে ম্যেলডুন আবার জাহাজে উঠল। এবার যে দ্বীপে এসে পৌঁছোল তারা, সে আরও ভয়ানক। এ দ্বীপে শুধু আগুন আর আগুন। পাহাড়গুলি জ্বলছে দাউ দাউ করে—নদীগুলিতে আগুনের স্রোত—মাটির বুকে গাছপালা, লতাপাতা, এমনকি ঘাসগুলি পর্যন্ত যেন আগুনের তৈরী।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে ম্যেলডুন এ দ্বীপে আর জাহাজ ভিড়োল না। কিন্তু স্রোতের টানে জাহাজ একেবারে তীরের গায়ে গিয়ে দাঁড়াল। স্রোতের টান এত প্রবল ছিল যে জাহাজখানা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল গিয়ে। সে ধাক্কা সামলাতে না পেরে পাঁচজন অনুচর অতর্কিতে পড়ে গেল একটা আগুনের নদীর মোহানায়। আর মুহূর্তেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল তাদের শরীর। ম্যেলডুনের অনুচরদের মধ্যে বাকী রইল আর মাত্র পঁচিশ জন। জাহাজ আবার ছুটে চলল সমুদ্রের জল কেটে। নানারূপ বিপর্যয়ে নাবিকেরা ক্লান্ত, শ্রান্ত। এদিকে খাবারও ফুরিয়ে এসেছে। জীবনের কোন আশাই আর নেই। এই যাত্রার যেন আর শেষ হবে না কোন দিন। এবার মরতে হবে। উদ্ধারের কোন পথ নেই। সীমাহীন নীল জলের অতল তলে রচিত হবে তাদের সমাধি। জীবন আর মৃত্যুতে যখন এমনি লড়াই চলেছে তাদের, এমনি একদিনে তারা আবার উপস্থিত হল এক

দ্বীপে। এ দ্বীপটিকে বলা যেতে পারে প্রাচুর্যের দ্বীপ। এমন একটি জাদু দ্বীপও যে সমুদ্রের বুকে লুকিয়ে আছে—একথা কে ভাবতে পেরেছে। মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভাঁজ করা মেঘগুলি শুয়ে আছে নীরবে। প্রতিদিন সকাল বেলা মেঘগুলির ভাঁজ খুলে যায় আর নানা রকমের সুস্বাদু খাবার সকলের সামনে এসে পড়ে। চেষ্টা নেই, পরিশ্রম নেই, নেই মাথা খাটাবার প্রয়োজন। আপনা থেকেই যখন যা দরকার হাতের কাছে এসে পড়ে। কোন কাজ নেই, কর্ম নেই—শুধু খাও আর ঘুমোও। কিন্তু কোন কাজ না করে এমনি অলসভাবে শুধু খেয়ে আর ঘুমিয়ে কতদিন আর পারা যায়—তায় ম্যেলডুনের লোকজন আবার বীর যোদ্ধা। তারা ওঠে অতিষ্ঠ হয়ে। পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। তারই রক্তিমাভার দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ একজন অনুচরের মাথায় আবার খুন চেপে বসল। সে একখানা পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল অপর একজনের মাথা লক্ষ্য ক'রে। আর যাবে কোথা? আরম্ভ হ'ল যুদ্ধ।

হৈচৈ শুনে ম্যেলডুন ছুটে এল। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই পাঁচজন শেষ হয়ে গেছে। বহু কষ্টে বাকী বিশজনকে থামিয়ে, একটি পাহাড়ের চূড়ায় মৃতদেহগুলিকে কবর দিয়ে ম্যেলডুন আবার জাহাজ ভাসালো নিষ্করুণ তরঙ্গের মাঝে।

আবার আর এক দ্বীপ। দ্বীপটির মাঝখানে দুটি দুর্গ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। একটি দুর্গের গায়ে ফুলের নানারকম কারুকার্য করা। অপরটিতে কোন কারুকার্য নেই। শুধু সাদা পাথরের গাঁথুনি। মিনিটে মিনিটে সেখানে ভূমিকম্প হচ্ছে—মাটির বুকে সমস্ত কিছুই থেকে থেকে কেঁপে উঠছে থরথর ক'রে। দুটি দুর্গের চূড়াও এক প্রাকারে এসে এমনভাবে ঠোকাঠুকি করছিল—যেন রক্ত-পিপাসায় পাগল দু'টো বন্য জানোয়ার।

ঐ চূড়া দুটোর দিকে চেয়ে চেয়ে ম্যেলডুনের অনুচরেরাও মেতে

উঠল। আবার তারা তুলল রণ-হুঙ্কার। রাগে তাদের চোখ হ'ল রক্তবর্ণ। দু'দলে ভাগ হয়ে তারা গিয়ে দাঁড়াল দু'টি দুর্গকে আশ্রয় করে। দু'দলেরই সেকি আস্ফালন! একদল অপর দলকে দেয় গালাগালি, ও দল এ দলকে দেয় অভিশাপ। এক দল তরবারি বের করে ও দলকে আক্রমণ করে, ও দলও ঝাঁপিয়ে পড়ে এ দলের উপর। ম্যেলডুন অনেক চেষ্টা করেও অনুচরদের থামাতে পারল না। একে একে প্রায় সকলে মৃত্যু বরণ করল। দু'দলে মাত্র দু'জন যখন বাকী, তখন আপনা থেকেই তাদের চেতনা ফিরে এল। উদ্যত তরবারি কোষবদ্ধ করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ম্যেলডুনের পিছু পিছু তারা আবার জাহাজে গিয়ে উঠল। জাহাজ আবার ভেসে চলল সাগরের বুকে।

চলতে চলতে জাহাজ আবার এসে ভিড়ল এক দ্বীপে। দ্বীপটির দিকে তাকাতেই মনের সমস্ত গ্লানি তাদের দূর হয়ে গেল। পাখীদের কলতানে প্রাণে যেন শান্তি ঢেলে দিল—ফুলের হাসিতে যে স্নিগ্ধ কোমলতা তা সকল দুঃখ-শোক ভুলিয়ে দিল। বনের পশুর চাহনিতেও হিংস্রতা নেই—আছে প্রীতি ও সহানুভূতি। হিংসা, দ্বেষ, লোভ, ক্রোধ এখানে টিকতেই পারে না যেন। তীরে উঠে কিছুদূর যেতেই—সামনে এক পর্ণকুটির। কুটিরের মাঝে বসে আছেন এক সৌম্যমূর্তি মহামুনি। সাদা চুল, সাদা দাড়ি—আর কি সাদা তাঁর গায়ের রং—যেন দেবদূত! তাছাড়া তাঁর কণ্ঠের স্বর আর চোখের চাহনি দেবতাদেরও হার মানায়।

ম্যেলডুন তার অনুচর দুজনকে নিয়ে সেই দেবতার মত মহামুনিকে প্রণাম করল। তিনি হাত তুলে তাদের আশীর্বাদ করে বললেন—যারা মানুষ হয়ে মানুষের রক্তপাত করে, বিপদ তাদের পদে পদে—ধ্বংস তাদের অনিবার্য। যতদিন মানুষ একে অপরকে শত্রু ভেবে এমনি রক্ত-পিপাসায় মেতে থাকবে, ততদিন পৃথিবীর শান্তি নেই,

কুটিরের মাঝে বসে আছেন এক সৌম্যমূর্তি মহামুনি (পৃঃ ৮)
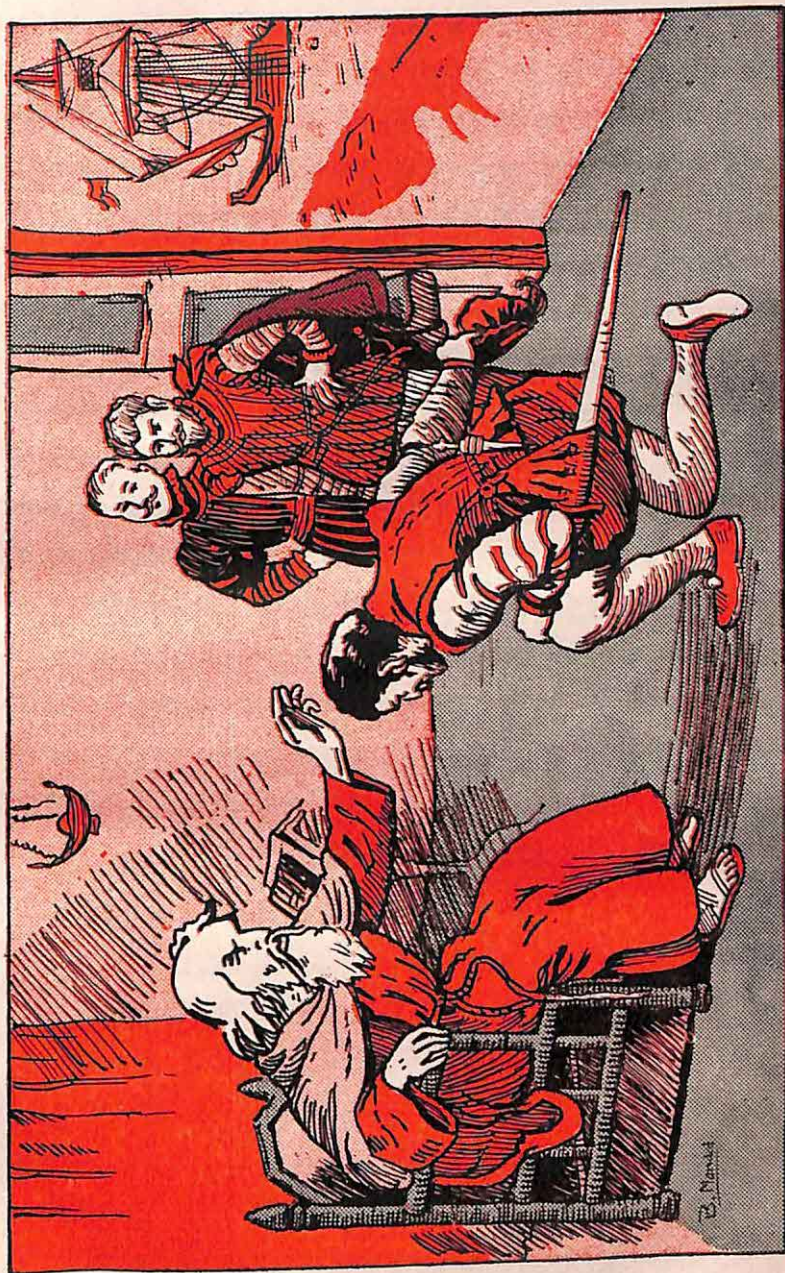
ততদিন ভগবানের কঠিন দণ্ড এমনি করেই নেমে আসবে তাদের মাথার ওপরে। প্রতিহিংসার পথে তোমরা পা বাড়িয়েছিলে, তাই তোমাদের আজ এই দুর্দশা। ভগবানের শক্তির কাছে মাথা নত কর। তাঁকে ধন্যবাদ দাও, ম্যেলডুন, যে আজ অন্ততঃ তুমি নিজে ঐ দু'জন অনুচর নিয়ে বেঁচে আছ। শত্রুকে ক্ষমা কর, তবেই পাবে সুখ—পাবে শান্তি। এই বলে মহামুনি চুপ করলেন। তাঁকে প্রণাম করে ম্যেলডুন অনুচরদের সাথে আবার জাহাজ ভাসাল। এবার আর তাদের পথ ভুল হ'ল না। দু'একদিন চলার পরেই তাদের জাহাজ এসে পৌঁছোল শত্রুর দেশে। ম্যেলডুনের শত্রু তীরেই দাঁড়িয়েছিল। এখন অনায়াসেই তাকে হত্যা ক'রে প্রতিশোধ নেওয়া যায়। কিন্তু ম্যেলডুন তা করল না। মহামুনির কথায় তার চোখ খুলে গিয়েছে। সে জাহাজ চালিয়ে দিল দেশের দিকে। শত্রুর দিকে চেয়ে বলল—আজ থেকে তুমি আর আমার শত্রু নও। আমরা মানুষ, মানুষের বন্ধু।

উপরে মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ। অনুকূল হাওয়ায় জাহাজ এগিয়ে চলেছে। ম্যেলডুন ও তার অনুচর দু'জনের চোখে পৃথিবী যেন এক নূতনরূপে সুন্দর ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দূরে দেখা যাচ্ছে ফিন দ্বীপের তটরেখা।

[* M. D. Belgrave-এর ইংরেজী গল্প অবলম্বনে লেখা]

—*—

গ্যামেলিন

সদাশয় রাজা এডওয়ার্ড তখন ইংলণ্ডের সিংহাসনে। লিঙ্কনসায়ারের এক জমকালো রাজপ্রাসাদতুল্য ভবনে বাস করতেন নাইট উপাধিধারী এক বিখ্যাত ধনী। লিঙ্কনসায়ার অঞ্চলে তিনি প্রভু সার জন নামে পরিচিত ছিলেন। নিজের জমিদারীতে তো বটেই, জলাভূমির আশেপাশেও অনেক দূর জুড়ে তাঁর ক্ষমতা ছিল অসীম। লোকে যেন তাঁর কথায় মন্ত্রচালিতের মত উঠত বসত। এমনি ছিল তাঁর প্রতাপ।

সার জন বৃদ্ধ হয়েছেন। দিন ফুরিয়ে এসেছে তাঁর। তিনি মনে করলেন উইল করে, জমিদারী ছেলেদের ভাগ করে দিয়ে জীবনের বাকী ক'টা দিন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতিতে কাটিয়ে দেবেন। সার জনের ছিল তিনটি ছেলে।

তাঁর বড় ছেলের নামও জন। তার বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি, কিন্তু তাকে কোন কাজেই বিশ্বাস করা যায় না—স্বভাব তার ভাল নয়।

দ্বিতীয় ছেলের নাম ওথো। বড়র চেয়ে বেশী ছোট নয় সে। সাদাসিধে গোবেচারা মানুষ—ইচ্ছাশক্তি বা বুদ্ধি তার কোনটাই নেই।

ছোট ছেলের নাম গ্যামেলিন। এখনও বালক। তবে বালক হলেও তার চোখে মুখে ছিল প্রতিভার দীপ্তি ; সারা দেহে ছিল শক্তির আভাস। তিন ভাইয়ের মধ্যে সকলে তাকেই বেশী ভালবাসত। সার জনও বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর ছেলেদের মধ্যে একমাত্র গ্যামেলিনই বড় হয়ে, হবে মানুষের মত মানুষ—সকল বিষয়ে উপযুক্ত, সকল কাজে নির্ভরযোগ্য। তাই তিনি স্থানীয় অন্যান্য নাইট আর লর্ডদের তাঁর বাড়ীতে ডেকে এনে বললেন—আপনাদের সঙ্গে বহু

সুখ দুঃখ ভাগ করে নিয়ে এই পৃথিবীতে আমি এতদিন বাস করেছি। এবার আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে। আপনারা আমায় বিদায় দিন। আর আমার এই বিরাট সম্পত্তির যে উইল আমি রেখে যাচ্ছি আপনারাই হবেন তার সাক্ষী। এই আশাতেই আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছি।

নাইট ও লর্ডেরা আগ্রহভরে তাঁর মুখের দিকে তাকাল। সার জন বলতে লাগলেন—ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা জানেন, প্রচলিত প্রথানুযায়ী বড় ছেলেকেই সম্পত্তির প্রধান অংশ দিয়ে যাওয়া পিতার কর্তব্য ; কিন্তু আমি আমার সম্পত্তির প্রধান অংশ দিয়ে যাচ্ছি আমার ছোট ছেলে গ্যামেলিনকে। আমার চোখ যদি আমাকে ঠকিয়ে না থাকে, তবে একথা নিশ্চয় যে আমার তিন ছেলের মধ্যে সেই হবে মানুষের মত মানুষ। বড় ছেলে জন পাবে পাঁচখানি আবাদী জমি, যা আমি পৈতৃক সম্পত্তি হিসাবে পেয়েছিলাম। অপর পাঁচখানি আবাদী জমি, যা আমি আমার বাহুবলে অর্জন করেছি, তার মালিক হবে ওথো। এই দশখানি আবাদী জমি বাদ দিয়ে আমার সমস্ত জমিদারী আমি আমার ছোট ছেলে গ্যামেলিনকেই দিয়ে যাব। তবে যতদিন সে বালক থাকবে, ততদিন জনই তার অভিভাবকরূপে সব দেখাশুনো করবে। আপনারা পাঁচজনে দেখবেন গ্যামেলিন যেন প্রতারিত বা বঞ্চিত না হয়। ভগবানের কাছেও এই-ই আমার একান্ত প্রার্থনা।

এর কিছুদিন পরেই সার জন একদিন চোখ বুজলেন এজন্মের মত। তাঁর বড় ছেলে জন হল গ্যামেলিনের অভিভাবক। কিন্তু সার জনের শেষ প্রার্থনা বুঝিবা বিফল হয়! অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল তাঁর বড় ছেলে জন উইলের কোন সর্তই মানছে না, এমনকি গ্যামেলিনের প্রতি ব্যবহারেও সে নিতান্তই হীন ও নীচ মনের পরিচয় দিচ্ছে। মানুষের পক্ষে মানুষের উপর যতরকমে অত্যাচার করা সম্ভব

জন গ্যামেলিনের উপর তা করতে লাগল। যে গ্যামেলিন একদিন এতবড় একটা জমিদারীর মালিক হবে, জন তার লেখাপড়ার কোন ব্যবস্থা তো করলই না, উপরন্তু সে তাকে বাধ্য করল চাকরবাকরদের সঙ্গে খাবার খেতে, তাদের সঙ্গে তাদের ঘরে শুতে।

তা ছাড়াও গ্যামেলিন যাতে ভালো ছেলেদের সঙ্গে না মিশতে পারে, শুধু খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশে খারাপ হয়ে যায়, তার জন্যও কোনও ব্যবস্থার ত্রুটি রাখল না জন। দুষ্টবুদ্ধি, কুমতলবী জন ভেবেছিল, এমনি করে কুপথে থেকে গ্যামেলিনের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। চুরি, ডাকাতি, হত্যা—এই-ই হবে তার পেশা। তারপর হয়তো একদিন এমনি একটা হত্যাকাণ্ড অথবা ডাকাতি সে করে বসবে, যাতে হয় তাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হবে, না হয় ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে। আর তাহলেই সমস্ত জমিদারীর মালিক হতে পারবে জন নিজে। কিন্তু জনের মনের এই আশা সফল হ'ল না। সে গ্যামেলিনের উপর যতই অত্যাচার করতে লাগল, গ্যামেলিন ততই কষ্টসহিষ্ণু আর ভদ্র হয়ে উঠতে লাগল। চাকরবাকরদের সঙ্গে যতই তাকে একই খারাপ খাবার দেওয়া হতে লাগল, ততই যেন তার দেহের শক্তি বেড়ে যেতে থাকল আর গরীব দুঃখীদের প্রতি ধনীদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার মন হয়ে উঠতে লাগল বিদ্রোহী। সে হ'ল দরিদ্র আর ডানপিটে ছেলেদের বন্ধু। নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধি আর দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির জোরে গ্যামেলিন নিজের লেখাপড়া আর নানা রকমের শরীরচর্চার ব্যবস্থাতো করলই, তাছাড়া যে সব গরীব আর ডানপিটে ছেলেরা তার সঙ্গে মিশত তাদেরও সে সুন্দর, সবল ও শিক্ষিত করে তুলল।

জন বুঝতে পারল গ্যামেলিনকে দমিয়ে রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। সত্যিকারের একজন মানুষ সে হবেই। তাই সে অন্যপথ ধরল। বড় হয়ে গ্যামেলিন যাতে তার প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে লাভবান না হতে পারে, তারই চেষ্টায় সে মেতে উঠল। গ্যামেলিনের অংশ

থেকে প্রজাদের সে তাড়িয়ে দিল। আবাদী জমিগুলি, যা সোনার ফসলে ভরে যেত প্রতিবছর, অনাবাদী পড়ে রইল। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই গ্যামেলিনের সমস্ত সম্পত্তি অনুর্বর পতিত জংলা ভূমিতে পরিণত হ'ল। যা ছিল মানুষের বাসস্থান তা-ই হয়ে উঠল বন্য পশুর আবাসস্থল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি গ্যামেলিন এসমস্তই বহু আগে থেকে বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু তখনও সে ছিল শিশু এবং অসহায়। তাই সে কিছুই বলেনি। বড় ভাইয়ের সমস্ত অন্যায়, সমস্ত অত্যাচার নীরবেই সে সহ্য করে এসেছে। কিন্তু এখন সে বড় হয়ে উঠেছে। বড় ভাইয়ের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার দিন এসে গেছে তার। তাই একদিন গ্যামেলিন তার দাদার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার জন্য তাদের বসবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। চাকরবাকরদের সঙ্গে তারও এ ঘরে প্রবেশ করা বারণ ছিল। জন তাকে সেই ঘরে ঢুকতে দেখেই রেগেমেগে অস্থির হয়ে উঠল! ভীষণ রেগে সে বলে উঠল—এ ঘরে ঢুকতে না তোকে বার বার বারণ করা হয়েছে। এক্ষুনি এখান থেকে বেরিয়ে যা, হতভাগা বোথাকার। গিয়ে দেখ্, আমার খাবার তৈরী হয়েছে কিনা।

গ্যামেলিন এমনিই একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সে বলল, নিজের খাবার তুমি নিজেই দেখে নাও গিয়ে। ও কাজ আমার নয়। আর আমি হতভাগাই বা কিসে। তুমি ও আমি তো একই পিতার সন্তান। এতদিন তোমার নিষ্ঠুর ব্যবহার আমি মাথা পেতে নিয়েছি, অমানুষিক অত্যাচার চুপ ক'রে সহ্য করেছি। কিন্তু আর নয়।

গ্যামেলিনের এতখানি পরিবর্তন জন ভাবতেই পারেনি। সে যেমনি অবাক হ'ল তেমনি রাগে তার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল।

গ্যামেলিন কিন্তু থামল না। সে বলে যেতে লাগল—বাবা আমার জন্য যে সব জিনিস রেখে গেছেন সে সব কোথায়? আমার

জমিজমার কি দশা করেছ তুমি? এইভাবে তুমি বাবার আদেশ পালন করছ? তিনি কবর থেকে উঠে এসে যদি জিজ্ঞেস করেন, কি উত্তর দেবে তুমি?

জনের মধ্যে মনুষ্যত্ব বলে কোন জিনিস ছিল না। সে ছিল প্রকৃতই কাপুরুষ। শক্তিমান তরুণ ছোটভাইয়ের কথা শুনে সে ঘাবড়ে গেল। আবার রাগও হ'ল তার খুবই। সে দুজন চাকরকে ডেকে গ্যামেলিনকে আচ্ছা করে প্রহারের আদেশ দিল। ভৃত্যেরা এ আদেশ পছন্দ ক'রল না। তারা সকলেই গ্যামেলিনকে ভালবাসত! কিন্তু তারা কি করবে? প্রভুর আদেশ, পালন না করলে যে তাদের চাকরী থাকবে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাই তারা গ্যামেলিনের দিকে এগিয়ে এল। সামনেই পড়েছিল একটা হামানদিস্তা। চাকরদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে গ্যামেলিন সেটাকেই তুলে নিল হাতে।

গ্যামেলিনের দেহে ছিল অদ্ভুত শক্তি। হামানদিস্তার এক এক ঘায়েই সে তিন তিন জন চাকরকে মেজের উপর ফেলে দিল। কাণ্ড দেখে অপর তিনজন ভয়ে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' নীতি অনুসরণ ক'রে একেবারে চোঁ-চাঁ দৌড় দিল। অন্যান্য চাকরবাকর গ্যামেলিনের কাণ্ড দেখে যে যেদিকে পারল পালাতে শুরু করল।

জন দেখল এবার তার পালা। গ্যামেলিন এবার তাকেই আক্রমণ করবে। সে আর এক মুহূর্তও দেরী করল না; দেহের সমস্ত শক্তি এক ক'রে ছুটে উঠে গেল দোতলায়; সামনে যে ঘর পেল, তার মধ্যেই ঢুকে পড়ে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। তারপর সে ভেতর থেকে ডেকে বলল—'গ্যামেলিন রাগ কোরোনা ভাই। ওপরে এস। সমস্ত ব্যাপার তোমায় বুঝিয়ে বলছি।'

—'নিশ্চয়ই আসব। তোমার সাথে সন্ধিও হবে। কিন্তু তার আগে তুমিই নিচে নেমে এস। যুদ্ধটা হয়ে যাক, তবেতো সন্ধির

কথাবার্তা হবে।'—হেসে হেসে উত্তর দেয় গ্যামেলিন। হামানদিস্তাটা তখনও তার হাতে।

জন নিচে নেমে আসবে কি, ভয়ে সে একেবারে কাঁপতে লাগল। গ্যামেলিন বড় হয়েছে, তার গায়েও যথেষ্ট জোর। এসবই অবশ্য জন জানত। কিন্তু সে জোর যে এত বেশী তা' আগে সে বুঝতে পারে নি।

হাসবার বৃথা চেষ্টা ক'রে সে ভীত ম্লান মুখেই বলল—'আমায় বিশ্বাস কর ভাই, তোমাকে অপমান করার বা তোমার উপর অত্যাচার করার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। শুধু তোমার সাহস আর শক্তি পরীক্ষা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তুমি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। তোমার সাহস ও শক্তি দেখে কি যে আনন্দ পেলাম, তা আর তোমায় কি বলব। সে যা হোক, আমিই নিচে নেমে আসছি। তুমি শুধু তোমার হাতের ঐ হামানদিস্তাটা দূরে ফেলে দাও। আজ থেকে আমরা ভাই ভাই।'

গ্যামেলিনের বুঝতে দেরি হ'ল না দাদার ভয়টা কোথায়। সে হেসে হামানদিস্তাটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তখন কতকটা নির্ভয় হয়ে জন নেমে এল নিচে। জন নিচে নেমে আসতেই গ্যামেলিন ব'লল—'যা হবার হয়েছে। তুমি এবার বাবা যে সম্পত্তি দিয়ে গেছেন, তা আমায় বুঝিয়ে দাও। যদিও এখনও আমার বয়স যথেষ্ট নয়, তাহলেও আমি আর তোমার সঙ্গে থাকতে রাজী নই। আমার যা কিছু, সব বুঝে পেলেই আমি চলে যাব। তুমি সুখে তোমার সম্পত্তি ভোগ দখল কর। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।'

—'তাই হবে'—জন উত্তর দেয়—'তবে তার জন্য কয়েক মাস সময় আমায় দিতে হবে। সব হিসাবনিকাশ করতে কিছুটা সময়তো লাগবে। তাছাড়া তোমার ভাগের কতকগুলি জমিকে চাষের উপযুক্ত করে তুলতেও হবে।'

গ্যামেলিন একটু ভুল করল। সে ভাবল, দাদা বোধ হয় তার ভুল

বুঝতে পেরেছে, আর কখনও তার উপর অত্যাচার বা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তাই সে সরল বিশ্বাসেই দাদার কথায় রাজী হয়ে গেল।

কিন্তু 'স্বভাব যায়না ম'লে'। শয়তানী আর চাতুরী ধূর্ত জনের রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে, সে তা থেকে মুক্তি পাবে কি করে? উপরে উপরে সে গ্যামেলিনের সঙ্গে এমন ব্যবহার করত, যাতে মনে হত সত্যিই বুঝি সে শুধরেছে। গ্যামেলিনকে আর চাকরবাকরদের সঙ্গে নোংরা বিছানায় শুতে হত না। সে এখন ভাল ঘরে ভাল বিছানাতেই শুতে পেত। তার পোশাকআশাকও এখন ভদ্র ঘরের ছেলেদের উপযুক্ত। জনের পাশে ব'সে সে এখন ভাল খাবারই খেতে পায়। গ্যামেলিনের সুখসুবিধার সমস্ত ব্যবস্থাই জন করেছে। কিন্তু সে তা করেছে বাইরে থেকে কেউ যাতে তার মনের গোপন মতলব জানতে না পারে তারই জন্য। গ্যামেলিনকে ভালবেসে অথবা কর্তব্যবোধে সে এরকম করেনি। নানারকম সুখসুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়ে গ্যামেলিনকে ভুলিয়ে রেখে জন গোপনে মতলব আঁটছিল কি করে গ্যামেলিনকে এই পৃথিবী থেকেই সে সরিয়ে দেবে আর নিজে নিষ্কণ্টক হয়ে সমস্ত জমিদারিটা ভোগ করবে।

কিছুকাল কেটে গেল। একদিন গ্যামেলিন খবর পেল যে, তাদের বাড়ী থেকে কয়েক মাইল দূরে এক জায়গায় মল্লযুদ্ধের প্রতিযোগিতা হবে। বিজয়ীর পুরস্কার একটি আংটি আর একটি ভেড়া। জন গ্যামেলিনের শিক্ষাদীক্ষা অথবা খেলাধূলার কোন ব্যবস্থা না করলেও গ্যামেলিন যে নিজের চেষ্টায়ই লেখাপড়া শিখেছিল আর নানারূপ ব্যায়ামচর্চাও করেছিল তা তো আগেই বলেছি। তার ব্যায়ামচর্চার মধ্যে কুস্তিও ছিল একটি। তাই প্রতিযোগিতার খবর পেয়ে সে ঠিক করল এতে যোগ দিয়ে মল্লযুদ্ধে নিজের দক্ষতা পরীক্ষা করবে।

মল্লভূমিতে পৌঁছোনোর জন্য সে জনের কাছে একটি ঘোড়া চাইল। জন সমস্ত শুনে মনে মনে ভাবল—বোকাটা এবার নিশ্চয়ই মরবে। মল্লযুদ্ধের ও জানে কি? আর ওর মৃত্যু হলে আমিও নিরাপদ। এই রকম ভেবে সে মৃদু হেসে বলল—'বেশ কথা! ঘোড়া তোমায় দেব না তো কাকে দেব ভাই! আস্তাবলে গিয়ে নিজের মনোমত ঘোড়া তুমি নিজেই বেছে নাওগে। এর পর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, গ্যামেলিনের জন্য যেন তার কতই না দরদ, তার চেয়ে শুভাকাঙ্ক্ষী গ্যামেলিনের যেন আর কেউ নেই, এমনি ভাব দেখিয়ে সে আবার বলল—'ভগবান করুন, তুমি বিজয়ী হয়ে ফিরে এসো।'

জনের মুখের কথার সঙ্গে তার নিজের মনের ভাবনার মিল না থাকলেও ভগবানের ইচ্ছার মিল ছিল। গ্যামেলিনই পেল বিজয়ীর পুরস্কার।

সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে গ্যামেলিন এসে পৌঁছোল মল্লভূমিতে। বহুক্ষণ আগেই আরম্ভ হয়েছে প্রতিযোগিতা; একরকম শেষ হয়ে গেছে বললেই হয়।

একটি যুবক চাষী,—তার দিকে চাইলেই বেশ বুঝতে পারা যায় যে, তার দেহে যেমন অসীম শক্তি তেমনি সে বেপরোয়া,—সব প্রতিযোগীদেরই হারিয়ে দিয়েছে। এমন নির্দয়ভাবে সে সবাইকে মেরেছে যে, প্রতিযোগীদের কারও ভেঙেছে হাত, কারও ভেঙেছে পা, কারও-বা হাত-পা দুই-ই ভেঙেছে,—আবার কেউ-বা অজ্ঞান হয়ে তখনও পড়ে আছে মাঠের মধ্যে। হাজার হাজার দর্শক একটা নিষ্ঠুর উল্লাসে চিৎকার করছে। আর কোন প্রতিযোগী নেই। ঠিক হল ঐ যুবক চাষীই পাবে বিজয়ীর পুরস্কার—একটি ভেড়া আর একটি সোনার আংটি।

এমন সময় গ্যামেলিন এসে দাঁড়াল বিচারকদের সামনে।

—কি চাও তুমি ?—জিজ্ঞেস করেন তাঁরা।

—প্রতিযোগিতায় নামতে চাই।—বলল গ্যামেলিন।

দর্শকদের মধ্যে নূতন উত্তেজনা এল। গ্যামেলিনের চেহারা দেখে কারোরই বুঝতে বাকী রইল না যে এবার একটা যুদ্ধের মত যুদ্ধ হবে। একে হারানো সোজা হবে না কিছুতেই। সকলেই চিৎকার করে বলতে লাগল—চালাও, চালাও—জোর্‌সে চালাও।

প্রায় আধঘণ্টা চলে গেল। কেউ কাউকে হারাতে পারল না। এক একবার মনে হতে লাগল যুবক চাষীই বুঝি জিতবে, পরক্ষণেই আবার মনে হয় গ্যামেলিন তাকে নিয়ে যেন পুতুল খেলা খেলছে। মাঠের চারিদিক ঘিরে হাজার হাজার দর্শক অধীর আগ্রহে যেন বোবা হয়ে গেছে—কি হয়, কি হয়! এত দ্রুত দুই মল্লবীর ঘুরপাক খাচ্ছিল যে তাদের মধ্যে কে যে গ্যামেলিন আর কে যে যুবক চাষী তা বোঝা যাচ্ছিল না। হঠাৎ দর্শকদল চিৎকার করে উঠল,—ফেলে দিয়েছে, ফেলে দিয়েছে। কে যে কাকে ফেলল, প্রথমটা কিছুই বোঝা গেল না। দেখা গেল দু'জনেই জড়াজড়ি হয়ে পড়ে আছে। একটু পরেই দেখা গেল গ্যামেলিন চাষীর বুকের উপর ব'সে দু'হাত দিয়ে তার দুটো হাত চেপে ধরে সকলের দিকে চেয়ে বীরের হাসি হাসছে। সকলেই এবার আনন্দে চিৎকার করে উঠল—জয়, গ্যামেলিনের জয়। চাষীটা গোঙাচ্ছে—তার বুকের তিনখানা পাঁজরার হাড় আর বাঁ-হাতটা ভেঙ্গে গেছে। গ্যামেলিন জিতেছে। কাজেই পুরস্কার সে-ই পেল—একটা ভেড়া আর একটা সোনার আংটি। তাছাড়া গ্রামের লোক সেদিন আর তাকে ছাড়ল না ; তার সম্মানের জন্য এক বিরাট ভোজের আয়োজন করল তারা।

পরদিন ভোরবেলা গ্যামেলিন যাত্রা করল নিজের গ্রামের দিকে। গ্যামেলিন তার ঘোড়ায় চড়ে চলল আগে আগে—যেন এক যুদ্ধজয়ী বীর সম্রাট। পিছনে চলেছে গ্রামের যুবকদল। তাদের হল্লা

আর হৈচৈতে আকাশ বাতাস আর গাছের পাতা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। তারা অনবরত চিৎকার করছে—সাবাস গ্যামেলিন, সাবাস বীর। এই বিরাট বিজয়-বাহিনী নিয়ে গ্যামেলিন তো এসে পৌঁছল তার নিজের বাড়ীতে, কিন্তু একি! সমস্ত দরজাই ভিতর থেকে বন্ধ কেন! দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করে গ্যামেলিন জানতে পারল যে তার দাদার আদেশেই ঐরূপ করা হয়েছে। গ্যামেলিন যে এমনভাবে বিজয়ীর পুরস্কার পাবে আর প্রায় তারই মত একদল বীর অনুচর নিয়ে ফিরে আসবে, জন তা' স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তাই তাকে ঐ ভাবে আসতে দেখে ভীরু জন ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়ে বাড়ীর দরজা জানালা সব বন্ধ করার আদেশ দিয়েছিল। সে ভেবেছিল বাড়ীর ভেতর ঢুকতে না পারলেই কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকগুলো ফিরে যাবে যে যার বাড়ী। আর যতক্ষণ না যায়, ততক্ষণ তার টিকিটিও যাতে কেউ দেখতে না পায়, এই জন্য সে গিয়ে লুকিয়ে ছিল উপরের তলার একটা ঘরে।

ব্যাপার স্যাপার দেখে গ্যামেলিন তো রাগে আর বাঁচে না। কোথায় বড় ভাই ছোট ভাইয়ের বিজয়ে ছুটে এসে আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরবে, তার আর তার অনুচরদের জন্য বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করবে, তা না, সে কিনা দিল সব দরজা জানালা বন্ধ করে! ভোজ দেওয়া দূরের কথা বাড়ীতেই ঢুকতে না দেবার মতলব। গ্যামেলিন লাফিয়ে পড়ল ঘোড়া থেকে। ছুটে গিয়ে দারোয়ানটার ঘাড় ধরে সে তাকে ছুঁড়ে মারল দূরে।

তারপর দশ-বারো জন মিলে লাথি মেরে মেরে একটার পর একটা দরজা ভেঙ্গে ফেলতে লাগল। গ্যামেলিনের কাণ্ড দেখে চাকরবাকর-গুলো তো একেবারে ভয়ে থ। যে যেখানে ছিল, সেইখানেই যেন তারা প্রাণহীন পাষাণমূর্তি হয়ে গেছে। গ্যামেলিন তাদের আদেশ দিল যতরকম ভাল খাবার রয়েছে সব জোগাড় করে ভোজের ব্যবস্থা

করতে। পোলাও, কালিয়া, মাংস, পিঠে, পায়েস—নানা রকমের ভাল ভাল খাবার তৈরী হ'ল। গ্যামেলিনের গায়ের জোর আর ধমকের কাছে জনের আদেশ গেল ভেসে। গ্যামেলিনই যেন বাড়ীর কর্তা। ভয়ে চাকরবাকরগুলো তার কথাতেই উঠতে বসতে লাগল জন ব'লে কেউ যে একজন এবাড়ীতে আছে, একথাই যেন তারা ভুলে গেছে। সাতদিন ধরে চলল এই ভোজনোৎসব। রাতদিন চলল গান, বাজনা, নাচ আর হৈ-হুল্লোড়। পাড়াগাঁয়ের গরীব চাষীর ছেলে সব—এমন ভাল খাবার তারা খায়নি কোনদিন, এমন ভাল বাড়ীতে থাকেনি কোনদিন। তাদের মনের আনন্দ যেন সাগরের বুকে ঢেউ তুলে নেচে বেড়াতে লাগল। তাদের হৈ-হুল্লোড়ে আর হুড়োহুড়িতে কত জিনিষপত্র যে তছনছ আর ভেঙে খানখান হয়ে গেল তার আর কোন ইয়ত্তা রইল না।

গ্যামেলিন কাউকে কোন কাজে বাধা দিল না। 'কেনই বা দেব ?'—সে ভাবল। দাদা যদি তাকে আর তার বন্ধুদের আসামাত্রই আদর করে ঘরে তুলে নিত, খাবার দাবার সুব্যবস্থা করত, কথা বলত—তবে তার বন্ধুরা খেয়ে দেয়ে আমোদ করে সেই দিনই চলে যেত। কিন্তু তাতো সে করলই না বরং সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিয়ে তার বন্ধুদের সামনেই তাকে যাচ্ছেতাই অপমান করল। সে যেন এ বাড়ীর কেউ নয়। সুতরাং তাকেও প্রমাণ করতে হবে যে সেও এবাড়ীর একজন মালিক—একা দাদাই এ বাড়ীর কর্তা নয়। তাই সে একদিনের জায়গায় বন্ধুদের নিয়ে সাত সাতটি দিন যেমন খুশি আমোদ আহ্লাদে কাটিয়ে দিল। দাদার কোন তোয়াক্কাই রাখল না। জন ভয়ে বেরই হ'ল না সেই উপরতলার ঘর থেকে। নিজের ঘরে বন্দী হয়ে জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল সে। পাড়াপড়শীরাও দুর্বৃত্তের এই দুরবস্থা দেখে একটুও দুঃখিত হ'ল না।

আটদিনের দিন গ্যামেলিনের বন্ধুরা বিদায় নিয়ে যে যার বাড়ী

চলে গেল। গ্যামেলিন প্রস্তুত হ'ল দাদার কাছে জবাবদিহির জন্য। সে পরিষ্কারই বুঝতে পেরেছিল যে এ কয়দিন ভয়ে বের না হলেও জন আজ আর তাকে ছাড়বে না; কারণ আজ আর তার বন্ধুরা নেই। আজ সে একা।

ঠিক তাই-ই-হ'ল। বন্ধুরা চলে যেতেই জন অগ্নিশর্মা হয়ে নিচে নেমে এল। তার তখন তেজ দেখে কে! রাগে চোখ দু'টোকে লাল করে সে বললো—'কেন তুই এমনি করে সাতদিন ধরে আমার জিনিষপত্র নষ্ট করলি ?'

—'আমি আর আমার বন্ধুরা যা করেছি'—গ্যামেলিন শান্তভাবেই জবাব দেয়—'তার প্রতিটি কাজের মূল্যই তো তুমি এতদিন ধরে আদায় করেছ দাদা! বাবার মৃত্যুর পর এত বছর ধরে আমার ভাগের জমিজমার খাজনা কি তুমিই নাওনি? আমার ঘোড়া আর গরু মোষগুলোকে খাটিয়ে যে আয় হয়, এতদিন ধরে তা কি তোমারই কোষাগারে যায়নি ? আমি আর আমার বন্ধুরা সাতদিনে তোমার যা ক্ষতি করেছি আর খেয়েছি, তার মূল্যের অনেকগুণ বেশী তুমি এতদিন ধরে নিয়েছো।'

জন দেখলো যে, ধমক দিয়ে গ্যামেলিনকে দমান যাবে না, কথার মারপ্যাঁচে তাকে কোণঠাসা করাও যাবে না। তাই সে অন্যপথ ধরল। নরম হয়ে বলল—যা হবার হয়েছে গ্যামেলিন! এবার ভাই তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমি বুঝতে পেরেছি, এতদিন ধরে তোমার উপর যে খারাপ ব্যবহার আমি করেছি, তুমি তারই প্রতিশোধ নিয়েছ। সে যাক, আজ থেকে আমাদের ঝগড়ার অবসান হোক্। আজ থেকে আমরা উভয়ে উভয়ের শুভাকাঙ্ক্ষী। আমি শপথ করে বল্ছি, আজ থেকে এক মাসের মধ্যে আমি তোমার সমস্ত সম্পত্তি তোমার হাতে ফিরিয়ে দেব।

গ্যামেলিন চিরকালই সরল প্রকৃতির। মনে তার কপটতা

নেই কোনদিনই। এবারেও যে জন তার সঙ্গে চাতুরী খেলছে, এ সন্দেহই তার মনে জাগল না। সে সরল মনেই বিশ্বাস করল দাদার কথা। এমনকি জন আবার যখন বলল, 'তবে একটা অনুরোধ আমি তোমার কাছে করছি ভাই, একটু খাতির চাইছি তোমার কাছে। তুমি যখন দারোয়ানটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, সত্যি বলতে কি, আমার ভীষণ রাগ হ'ল। রাগের চোটে চাকরগুলোর সামনেই আমি প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি যে তোমাকে খাবার ঘরের থামের সঙ্গে হাত পা বেঁধে রাখব। এখন যদি তা না করি চাকরগুলো মনে মনে হাসবে। আমার আর মুখ দেখাবার জো থাকবে না। তুমি দয়া করে তোমার হাত পা বাঁধতে দিলে, তবেই আমার মান বাঁচে। সত্যিসত্যি তো আর তোমায় বেঁধে রাখব না, শুধু ওদের দেখাবার জন্য আর কি!' সরল গ্যামেলিন জনের একথাও বিশ্বাস করে নিল। সে বলল, 'তা বেশতো, এ আর এমন অন্যায় অনুরোধ কি।'

জনের আদেশে একজন চাকর খুব মোটা আর শক্ত একগাছা শিকল নিয়ে এল। খাবার ঘরের মোটা থামটার সঙ্গে খুব শক্ত করে গ্যামেলিনের হাত পা বেঁধে তারপর শিকলের শেষদিকটা থামটার গায়ে বেড় দিয়ে সে তালা মেরে দিল।

জন যখন বুঝল যে কেউ ছাড়িয়ে না দিলে গ্যামেলিনের ছাড়া পাবার আর কোনই উপায় নেই, তখন সে বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল—'মূর্খ! এইবার তোকে বাগে পেয়েছি। দেখি, এবার কে তোকে রক্ষা করে। না খেতে দিয়ে তিলে তিলে তোকে মারব। এককোঁটা জলও কেউ তোর মুখে তুলে ধরবে না। এত দিনের দুশ্চিন্তা এবার আমার দূর হবে।'

দুষ্টু জন প্রচার করল যে গ্যামেলিনের মাথা খারাপ হয়েছে। পাড়াপড়শীরা মনে মনে একথা বিশ্বাস না করলেও, জন এতই

ধনী ও মতলববাজ ছিল যে সাধারণ লোক তো দূরের কথা, স্থানীয় মাতব্বররা পর্যন্ত টুঁ শব্দটি করতে সাহস পেল না।

দু'দিন দু'রাত কেটে গেল। গ্যামেলিনের না জুটল খাবার, না পেল সে তেষ্টার জল। তার শরীর ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসছিল। ক্ষুধার জ্বালায় সে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। আর উপায় নেই—এবার তাকে মরতেই হবে। চাকরবাকরগুলো মাঝে মাঝে গ্যামেলিনের সামনে দিয়ে আনাগোনা করছে। তারা সকলেই যেন তার দুর্দশায় মজা দেখছে—তাদের দিকে চেয়ে গ্যামেলিনের এরকমই মনে হতে লাগল। শুধু তার বাবার আমলের বৃদ্ধ ভৃত্য এ্যাডাম স্পেন্সারই বারবার তার দিকে চাইছিল সহানুভূতি ও করুণা-মেশান দৃষ্টি নিয়ে।

গ্যামেলিন আর থাকতে না পেরে, ইশারায় তাকে কাছে ডাকল। বহুকালের পুরানো ভৃত্য এ্যাডাম। গ্যামেলিনকে কত কোলেপিঠে করেছে সে। বন্দী গ্যামেলিনের অনাহারক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে প্রকৃতই দুঃখ পাচ্ছিল সে মনে। কিন্তু এ্যাডাম তো নিতান্তই মাইনের চাকর মাত্র। কি আর করতে পারে সে—মনে মনে দুঃখ করা ছাড়া! চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে, এ্যাডাম যখন দেখল যে কেউ কোথাও নেই, সে অতি ধীর পদক্ষেপে চলে এল গ্যামেলিনের কাছে। এ্যাডাম কাছে আসতেই গ্যামেলিন ফিসফিস করে বলল—'তুমি কি আমার বাঁচবার কোন উপায় করতে পার না এ্যাডাম? খিদেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে। না খেতে পেলে বেশীক্ষণ আর আমি বাঁচব না।'

—'বাঁচতে তোমাকে হবেই'—এ্যাডাম ফিসফিস করে উত্তর দেয়—'নাহলে জন তোমাকে না খেতে দিয়েই মেরে ফেলবে।'

—তাহলে আর দেরি কোরোনা। দুমুঠো খাবার আমায় এনে দাও। খিদেয় আমি মরে যাচ্ছি। আমার মাথা ঘুরছে।

করুণ-হৃদয় বৃদ্ধ ভৃত্য এ্যাডাম স্পেন্সারের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে

এল। সে মনে মনে ভাবল, যা হয় হবে। না হয় চাকরি যাবে, গ্যামেলিনকে খাবার সে দেবেই।

যখন সে দেখল যে সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত, এদিকে কারো আসবার সম্ভাবনা নেই, সে চুপিচুপি গিয়ে খাবার নিয়ে এল। গ্যামেলিনের খাওয়া হয়ে গেলে এ্যাডাম বলল—'কাল এই ঘরেই বিরাট ভোজসভা বসবে। তোমার দাদা এদিককার যত পাদ্রী আর অন্যান্য ধনীদের নিমন্ত্রণ করেছেন। আজ রাতে যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়বে, আমি এসে শিকলের গোড়ার দিকটা খুলে দিয়ে যাব। কিন্তু সাবধান, তুমি যেন শিকল খুলে বেরিয়ে এসো না। কেউ যেন বুঝতে না পারে তুমি ছাড়া পেয়েছ। তাহলে কিন্তু আর উপায় থাকবে না।'

এ্যাডাম আরো বলল—'কাল ভোজের উৎসব যখন পুরোদমে চলতে থাকবে, তুমি তোমার দুঃখের কাহিনী বলে সবার সাহায্য প্রার্থনা করবে। চার্চের পাদ্রীরা হয়ত দয়া করে তোমায় মুক্ত করে দেবেন। তা যদি হয় তাহলে তো কথাই নেই। কোন হাঙ্গামার মধ্যে আর যেতে হবে না। তুমিও মুক্ত হয়ে তোমার দাদার অন্যায়ের বিরুদ্ধে আদালতে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করতে পারবে। কিন্তু কেউ যদি তোমার কথায় কান না দেয়, তাহলে আমি ইঙ্গিত করা মাত্রই শিকল খুলে বেরিয়ে আসবে। আমি আগে থাকতে ভাল দেখে দুটো লোহার ডাণ্ডা ঠিক করে রাখব। মদের নেশায় সবাই চুর হয়ে থাকবে, বাধা দিতে কেউ এগিয়ে আসবে মনে হয় না। যদিও বা আসে, তাকে ঘায়েল করতে তোমায় বেগ পেতে হবে না। তারপর আমরা পালিয়ে যাব এখান থেকে।'

ক্রমে দিন ফুরিয়ে গেল। এল রাত। গভীর রাতে যখন সকলে ঘুমিয়েছে, চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকারের একটানা রাজত্ব চলেছে, এ্যাডাম এসে গ্যামেলিনের শিকলের গোড়া খুলে দিয়ে গেল। রাতও

ক্রমে শেষ হল। আবার এল দিন। এদিনও সুযোগমত এ্যাডাম এসে গ্যামেলিনকে কিছু খাবার দিয়ে গেল। খেতে পেয়ে গ্যামেলিনও তার মনের জোর আর দেহের শক্তি ফিরে পেল। সে অপেক্ষা করতে লাগল, কখন ভোজসভা বসবে। সাঁঝের ছায়া নামতে নামতেই, নিমন্ত্রিতেরা একে একে সবাই এসে উপস্থিত হলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই পান-ভোজনে মেতে উঠল সবাই।

কি বলবে তা' গ্যামেলিন আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল, সময় বুঝে সে তার দুঃখের কাহিনী বলে সকলের সাহায্য প্রার্থনা করল। প্রকৃত ব্যাপার কারোরই অজানা ছিল না। সবাই জানত গ্যামেলিনের মাথা খারাপ হয় নি। স্বার্থপর জন নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই কৌশলে তাকে শিকলে বেঁধেছে। তার মাথা খারাপ হবার কথা সে যা রটিয়েছে, তা একেবারে মিথ্যে। কিন্তু তা' জানলে কি হবে। দেশের যত ধনী রয়েছে, এমনকি গীর্জার পুরোহিতরা পর্যন্ত সকলেই, তাদের নিজের নিজের কর্তব্যের কথা ভুলে গিয়ে একমাত্র ভোগবিলাস, পান, ভোজন, আর নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি নিয়েই মেতে ছিল। যারা দুঃখী, যারা অত্যাচারিত, তাদের দিকে তো দূরের কথা— সমস্ত দেশ উচ্ছন্নে যেতে বসলেও তারা সেদিকে একবার চেয়ে দেখাও প্রয়োজন বোধ করত না। কাজেই গ্যামেলিনের করুণ কাহিনী তাদের মর্ম স্পর্শ করল না। গ্যামেলিন বাঁচুক, কি মরুক, তাদের কি আসে যায়। জনের ধনসম্পদ থাকলে তাদের ভোগবিলাসের সুবিধা,— তারা তাই-ই চায়। গ্যামেলিন যখন বুঝল যে তার কাতর প্রার্থনায় কেউই কান দেবে না, সে চাইল এ্যাডামের দিকে। এ্যাডাম চোখের ইশারা করতেই সে শিকলের বেড়ি খুলে, শিকলটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুহূর্তে ছুটে গেল এ্যাডামের পাশে। আগে থেকেই এ্যাডাম ভাল দেখে দু'খানা লোহার ডাণ্ডা লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল দরজার আড়ালে। দুজনে সেই ডাণ্ডা দুটো নিয়ে এমন অতর্কিতে তাড়া করল

সবাইকে যে, পানোন্মত্ত ভীরুর দল যে যেখান দিয়ে পারল ছুটে পালিয়ে গেল। দশ মিনিটের মধ্যে ঘর প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল।

রকমসকম দেখে জন তো ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিজের চেয়ারের উপরই অজ্ঞান হয়ে পড়ল। জ্ঞান ফিরতেই জন পালিয়ে যাবার জন্য ছুটল দরজার দিকে, কিন্তু মাঝপথেই গ্যামেলিন আর এ্যাডাম এসে তাকে ধরে ফেলল। জন নানারূপ কাকুতি-মিনতি, অনুরোধ-উপরোধ আরম্ভ করল বটে কিন্তু গ্যামেলিন তার কোন কথায়ই কান দিল না। বড় ভাই হয়ে জন তার প্রতি এতদিন ধরে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার করে এসেছে, এবারে তা চরমে পৌঁছেছিল। ভাইয়ের প্রতি তার ঘৃণা ও রাগের আর সীমা ছিল না। বড় ভাই বলে জনের প্রতি গ্যামেলিনের আর কোনও শ্রদ্ধা ছিল না। গ্যামেলিন আর এ্যাডাম দুজনে মিলে জনকে ঠিক গ্যামেলিনের মতো করেই বাঁধল সেই শিকল দিয়ে, সেই থামেরই সঙ্গে। ঠিক এমনি সময়ে এ্যাডামের এক বন্ধু ছুটে এসে খবর দিল যে তারা পবিত্র গীর্জার ধর্মযাজকদের ওপর লাঠি চালিয়েছে —এই অপরাধে শেরিফ তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য লোক পাঠিয়েছেন। শেরিফের লোকেরা এসে পড়ল বলে। কাজেই পালানো ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই।

এ্যাডাম বলল—আর এক মুহূর্তও দেরি নয়, গ্যামেলিন শিগগির চলে এসো। বাড়ীর পেছন দিকে যে গুপ্তপথ আছে, সেই পথে পালিয়ে যাই। ওরা আমাদের খোঁজ করলেও হদিস পাবে না।

—কোথায় যেতে চাও এ্যাডাম?—যেতে যেতেই প্রশ্ন করল গ্যামেলিন। —গ্রীনউডে।—উত্তর দেয় এ্যাডাম।—বেশ তাই চল।

গায়ের সমস্ত শক্তি নিয়ে তারা ছুটে চলল গ্রীনউডের দিকে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই নিরাপদে এসে উপস্থিত হল সেখানে।

প্রাণপণ ছুটেছে তারা, তাই তারা যেমনি পরিশ্রান্ত হয়েছে

তেমনি তাদের পেয়েছে তৃষ্ণা, আর লেগেছে ক্ষুধা। কিন্তু কোথায় জল আর কোথায়ই বা খাবার?

যাহোক, ওদের কপাল ভাল। বনের মধ্যে ওদের সঙ্গে দেখা হল একদল লোকের। তারাও একদিন গ্যামেলিনের মত বিনা দোষে রাজরোষে পতিত হয়ে আর আইনের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়ে পালিয়ে এসেছিল ঐ বনে। অনেকদিন থেকেই ঐ বনেই লুকিয়ে আছে তারা, কারণ কোনভাবে যদি সরকারের লোক তাদের খোঁজ পায়, তাহলে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে তাদের। ঐ দলের সবাই বেশ আমুদে আর কষ্টসহিষ্ণু। অন্ধকার ঘন বনের মধ্যে নানারকম বাধা-বিঘ্নে ভরা জীবনকে তারা আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করেছে। গ্যামেলিনের দুঃখের কাহিনী শুনে তারা তাকে ও এ্যাডামকে আনন্দের সঙ্গেই তাদের দলে গ্রহণ করল। শুধু তাই-ই নয় গ্যামেলিনের নানারকম গুণের পরিচয় পেয়ে, তাকেই তারা দলের সর্দার বলে স্বীকার করে নিল।

বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল। ন্যায়ের নামে মুষ্টিমেয় ধনী আর ক্ষমতাবানের অন্যায় তাদের যে সুখ, স্বাধীনতা আর শান্তি থেকে বঞ্চিত করেছে, এই নির্জন বনে গ্যামেলিন তার দলবল নিয়ে মনের আনন্দে সেই সুখ, স্বাধীনতা ও শান্তির মধ্যে কাল কাটিয়ে দিতে লাগল। এইভাবেই হয়ত জীবন কেটে যেত তাদের, কারণ হৃদয়হীন অত্যাচারী মানুষের মধ্যে আবার ফিরে যাবার তাদের আর কোন ইচ্ছেই ছিল না। ন্যায় ও ধর্মের নাম করে প্রবল যেখানে নির্বিচারে অত্যাচার করে চলেছে দুর্বলের ওপর, প্রবলের সুখের সৌধ যেখানে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে দুর্বলের অসহ্য দুঃখের মূল্যে, মানুষ যেখানে মানুষকে পদানত, উৎপীড়িত আর অসহ্য দুঃখের ভারে ক্লিষ্ট করে পৃথিবীর ঐশ্বর্য ভোগ করতে চায়, কি হবে

সেখানে গিয়ে। কিন্তু একটি সংবাদ গাামেলিনকে আবার সেই মনুষ্যত্বহীন মানুষদের মধ্যিখানে টেনে নিয়ে গেল।

একদিন গ্যামেলিন খবর পেল তার বড় ভাই সারা দেশের শেরিফ হয়েছে। তার কুশাসনে, অত্যাচারে, দেশবাসীর দুঃখের শেষ নেই। তাছাড়া নিজের খুশিমতো আইনের সাহায্যে সে গ্যামেলিনকে দেশের শত্রু বলে প্রচার করেছে। শুধু তাই-ই নয়, গ্যামেলিনের ছিন্ন মস্তকের জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে। খবর শুনে গ্যামেলিন ও এ্যাডামের রাগের আর সীমা-পরিসীমা রইল না। বাপের দেওয়া সব বিষয়-আশয় ছেড়েই গ্যামেলিন চলে এসেছে, কিন্তু তাতেও জনের হিংসার শেষ নেই। গ্যামেলিনের প্রাণ না হলে তার চলবে না। গ্যামেলিনের প্রত্যেকটি ধমনীর তাজা রক্ত রাগে যেন টগবগ করে ফুটতে লাগল। না, এতখানি সহ্য করা দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়। অনেক সহ্য করেছে সে, কিন্তু আর সে করবে না। জন ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। দেশের লোকের সুখ শান্তির দিকে না চেয়ে সে দেখছে শুধু নিজের সুখ। অথচ অর্থ ও কুমতলবের জোরে সে আজ সেই দেশের লোকেদেরই প্রভু হয়ে নির্বিচারে, নিজের খেয়ালমাফিক অত্যাচার উৎপীড়ন চালিয়ে গোটা দেশটাকেই দারিদ্র্য ও অশান্তিতে ভরে তুলেছে। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, গ্যামেলিন দাদার অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে লড়বে। দেশকে সে এই নিষ্ঠুর অত্যাচার উৎপীড়ন আর অন্যায় অবিচারের হাত থেকে বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। সে তখনি তার দলের আর সবাইকে ডাকল। সবাই মিলে পরামর্শ করে একটা মতলবও ঠিক করল, ঐ অত্যাচারী, স্বার্থপর, দুর্বলের নিষ্পেষক জনকে কিভাবে উচিত শিক্ষা দেবে।

এরই কয়েকদিন পরে জন বিচারাসনে বসে ষান্মাসিক বিচারসভা পরিচালনা করছিল। বিচারকক্ষে ঢুকবার দরজা বন্ধ। সহসা দরজার উপর মুহুর্মুহুঃ প্রবল আঘাত হতে লাগল। সরকারী অর্থে প্রস্তুত

গ্যামেলিন এগিয়ে গেল জনের বিচারাসনের দিকে (পৃঃ ২৯)

দরজা মজবুত হলেও, সে ধাক্কার বেগ সামলাতে পারল না। দু' একবার ক্ষীণ আপত্তি জানিয়ে দু-এক মিনিটের মধ্যেই দেয়াল থেকে ছিটকে পড়ল বিচারকক্ষের ভেতর। উন্মুক্ত দ্বারপথে ঢুকে পড়ল একদল সশস্ত্র লোক। এরা আর কেউ নয়, বিদ্রোহী গ্যামেলিন আর তারই অনুচরবৃন্দ।

গ্যামেলিনকে চিনতে জনের একটুও দেরি হল না। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। কথা বলার শক্তি পর্যন্ত সে হারিয়ে ফেলল। অন্যান্য কর্মচারীরাও হতবুদ্ধি হয়ে অপলক চেয়ে রইল প্রাণহীন পাষাণমূর্তির মত। অস্ত্রহীন অসহায় তারা—মনে মনে বেশ বুঝতে পারল যে আজ আর কাউকে প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে না। দিনের পর দিন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের মানুষের উপর তারা এতদিন যে অত্যাচার করে এসেছে, ন্যায়বিচারের নামে যে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েছে—আজ তার শেষ। গ্যামেলিনের প্রতি জন নির্বিচারে যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে এসেছে আজ গ্যামেলিন তার প্রতিশোধ তুলবে।

গ্যামেলিন এগিয়ে গেল জনের বিচারাসনের দিকে। নির্ভীক স্পষ্ট কণ্ঠে সে বলল—পাষণ্ড শেরিফ, এতদিন ধরে ন্যায়ের নামে যে অন্যায় চালিয়ে এসেছ, তার তুলনা নেই। যে ছোট ভাই, তোমার কোন ক্ষতি করেনি কোনদিন, তাকে তুমি অত্যাচারে অবিচারে দেশছাড়া করেছ। কিন্তু তাতেও তোমার হিংসা ও আক্রোশ মেটেনি। তুমি হাতে ক্ষমতা পেয়ে বিনা দোষে তাকে দেশের শত্রু বলে ঘোষণা করেছ,—যতরকমে সম্ভব তাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছ। শুধু তাই-ই নয়, ক্ষমতার অপব্যবহারে সারা দেশটাকেই তুমি ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছ। কিন্তু আর নয়, আজ তোমার ঘৃণ্য জীবনের অবসান হবে।

এই বলে গ্যামেলিন বিচারসভার কর্মচারীদের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে আদেশ করল। তারা ভয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল—

যেন প্রভুভক্ত চাকরের দল। গ্যামেলিন তার নিজের লোক বসিয়ে দিল সেই সব আসনে। জনকে সরিয়ে দিয়ে নিজে গিয়ে বসল শেরিফের আসনে। জন আর তার কর্মচারীরা হল গ্যামেলিনের বন্দী।

আরম্ভ হ'ল বন্দীদের বিচার। সকলেরই এক মত—দেশকে অন্যায়-অত্যাচার আর অশান্তির হাত থেকে বাঁচাতে হলে এই সব দুর্বৃত্তদের ফাঁসি দেওয়া ভিন্ন অন্য পথ নেই। এইভাবে জন ও তার অনুগতদের পাপ-জীবনের শেষ হ'ল।

কিন্তু এইখানেই তো শেষ নয়। একটা প্রদেশের শেরিফ ও বিচারালয়ের অন্যান্য কর্মচারীদের হত্যা করা যে আইনের চোখে কতবড় অপরাধ গ্যামেলিন তা জানে। সে গ্রীনউডে ফিরে না গিয়ে চলে এল ইংল্যাণ্ডে। সদাশয় রাজা এড্ওয়ার্ডের কাছে সে সব ঘটনাই খুলে বলল—একেবারে তার জীবনের শৈশব থেকে।

সবাই ভেবেছিল, জন যতই খারাপ লোক হোক না কেন, সে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী—বেআইনী ভাবে বিচারালয়ে ঢুকে গ্যামেলিন তাকে হত্যা করেছে। রাজা তাকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। কিন্তু এডওয়ার্ড তাকে ক্ষমা করলেন। শাস্তি তো দিলেনই না, রাজসরকারের বনবিভাগের কর্তা করে দিলেন গ্যামেলিনকে। তিনি বললেন—অন্যায়ের বিরুদ্ধে এমনি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে কজন? রাজ-সরকারে এমনি লোক যত বেশী থাকবে দেশের ততই মঙ্গল।

[* M.D. Belgrave-এর ইংরেজী গল্প অবলম্বনে লেখা]

ডায়ারমুড্ ও গ্রানিয়া

হাজার হাজার বছর আগেকার কথা। এখন মানুষ দেবতাদের দেখতে পায় না, শুনতে পায়না তাদের কথা। কিন্তু সে সময় এমনটি ছিল না। দেবতারা তখন মানুষের সঙ্গে কথা বলতেন, চলাফেরা করতেন মানুষের সঙ্গে এই পৃথিবীরই মাটির বুকে।

আমাদের এই ভারতবর্ষ থেকে অনেক দূরে—অনেক দেশ ছাড়িয়ে, সাগর পেরিয়ে একটি ছোট্ট দেশ আয়ার্ল্যাণ্ড। এই আয়ার্ল্যাণ্ডে তখন অনেক বীর যোদ্ধা বাস করতেন, আর তাদের মধ্যে ফিন্‌ই ছিলেন সবার চেয়ে সাহসী। তাছাড়া বিদ্যা, বুদ্ধি, ন্যায়পরায়ণতা ও সদাশয়তার জন্যও তাঁর খ্যাতি ছিল দেশবিদেশে। ফিনের একটি প্রকাণ্ড দল ছিল। দলের প্রত্যেকেই ফিনের মতই সাহসী, বীর ও ন্যায়পরায়ণ। ফিনের নামেই দলের নাম হয়েছিল ফিন্না। ওদের মধ্যে আবার শক্তিশালী গল, কবি ওইসিন্ আর সুশ্রী ডায়ারমুড্ ছিল সবার সেরা! ডায়ারমুড্ ছিল ফিনের আত্মীয়। ফিন্ তাকে নিজের ছেলের মতই ভালবাসতেন।

সুনাম নিয়েই ফিনের দিনগুলি বেশ সুখে কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু ভগবান তাতে বাদ সাধলেন। কিছুদিন অসুখে ভুগে ফিনের স্ত্রী স্বর্গে চলে গেলেন। একে বৃদ্ধ হয়েছেন, তার উপর এই শোক—ফিন্ একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। কিছুই আর তাঁর ভাল লাগে না। ফিনের দুঃখ দেখে ফিন্নারা যেমন হল দুঃখিত, তেমনি হল চিন্তিত—ফিন্‌কে কি করে সুখী করা যায়। শেষে একদিন শক্তিশালী গল্ বলল—ফিন্, আপনি আবার বিয়ে করুন। ফিন্ বললেন—তোমার প্রস্তাব উত্তম বটে, তবে কথা হচ্ছে যে আমার এই পড়ন্তি বয়সে কোন্ মেয়েই বা আমায় বিয়ে করতে চাইবে, আর কোন্ মেয়ের বাপই-বা রাজী

হবে? আমার এই বৃদ্ধ বয়স আর মাথার পাক-ধরা চুল দেখে সব মেয়েই ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে।

—এ আপনার ভুল ধারণা। পৃথিবীর কোনখানে এমন কোন মেয়ে থাকতে পারে না যে ফিনের মত বীরকে বিয়ে করতে পেলে গর্ব বোধ করবে না।—বেশ জোর দিয়েই বলল সুশ্রী ডায়ারমুড্।

—আর মেয়ে খুঁজতে আমাদের দূরেও যেতে হবে না।—বলল কবি ওইসিন্,—এই দেশেরই রাজার মেয়ে গ্রানিয়া ছুনিয়ার সেরা সুন্দরী, আর সকল রকমেই ফিনের স্ত্রী হবার যোগ্য।

রাজার সঙ্গে ফিনের ছিল শত্রুতা। তাই তিনি প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করলেন। বললেন—সুন্দরী সে মেয়ে হতে পারে, কিন্তু শত্রুর কাছে কোন অনুগ্রহ আমি চাই না। রাজা যদি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, নিশ্চয়ই আমরা সুখী হব না।

—আমি কিন্তু শুনেছি, রাজা আর আপনার সঙ্গে শত্রুতা রাখতে চান না।—আগ্রহের সঙ্গে বলে ডায়ারমুড্—শান্তিস্থাপনের চিহ্ন স্বরূপ নিশ্চয়ই তিনি আনন্দের সঙ্গে এ প্রস্তাবে রাজী হবেন।

ফিন্ কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—আমিও রাজার মিত্রই হতে চাই। বেশ, তাহলে গল আর ওইসিন্—তোমরা ছুজন রাজপ্রাসাদ টিমহেয়ারে গিয়ে রাজাকে জানাও যে আমি তার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।

ডায়ারমুডেরও ইচ্ছে হল সে গল আর ওইসিনের সাথে টিমহেয়ারে যায়। তাই সে বলল—আপনার আদেশ পেলে আমিও যেতে চাই—আপনার গুণগান করার জন্য। প্রীতির চোখে ডায়ারমুডের দিকে চেয়ে ফিন্ উত্তর করলে—না ডায়ারমুড, তোমাকে না হলে আমার চলবে না। এই শূন্য গৃহে, ছুঃখের দিনে তুমিই আমার একমাত্র আনন্দ। হায়, তোমার মতো আমার কপালের উপরও যদি এমনি একটি প্রীতি-চিহ্ন থাকত!

ডায়ারমুডের কপালে ঠিক মাথার কাছে একটি দাগ ছিল। সবাই বলত যে একদিন রাত্রে ডায়ারমুড্ যখন ঘুমিয়ে ছিল, তখন সৌন্দর্য ও প্রেমের দেবতা তার কপালে ঐ দাগটি এঁকে দিয়েছিলেন। আশ্চর্য এই যে দাগটি যাঁর চোখে পড়তো সেই ডায়ারমুড্‌কে ভাল না বেসে পারত না। যে-ই ঐ দাগ দেখে, সেই তাকে ভালবাসা জানায়। শেষে এমন হল যে ভালবাসাই হল যেন অত্যাচার। ভালবাসার এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ডায়ারমুড্ ঐ দাগটি মাথার চুল দিয়ে ঢেকে রাখত। ফিন্ ঐ দাগের কথা বলতে ডায়ারমুড্ হেসে বলল—মহান ফিনের নিজ গুণাবলীই যথেষ্ট। দৈবশক্তি দুর্বলেরই প্রয়োজন।

এদিকে গল আর ওইসিন্ চলে গেল রাজার কাছে। রাজা তাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন এবং তাদের মুখে ফিনের প্রস্তাব শুনে বললেন—বিখ্যাত বীর ফিনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে আমি সুখীই হতাম, কারণ আমি আর ফিনের সঙ্গে শত্রুতা রাখতে নারাজ! তবে মেয়ের এখন মত হলেই হয়। আমি তাকে কথা দিয়েছি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কারো সঙ্গে আমি তার বিয়ে দেব না। তাই চলুন আমরা তার কাছে যাই। শুনি, তার কি মত।

রাজা গল ও ওইসিন্‌কে সঙ্গে নিয়ে অন্তঃপুরে মেয়েদের মহলে গেলেন। রাজকুমারী গ্রানিয়া নিজ কক্ষে সিংহাসনে বসেছিলেন। কি রাজকন্যার রূপ! পাকা ধানের মত সোনার বরণ, কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ, দুধের মত সাদা গায়ের রং, নীল দুটি চোখের তারায় সে কি অপূর্ব সৌন্দর্য আর রহস্য। এত রূপ গল ও ওইসিন্ তাদের জীবনে আর কখনও দেখেনি। যাহোক, তারা ফিনের নানারূপ প্রশংসা করে রাজকুমারীর কাছে পেশ করল তাঁর বিবাহের প্রস্তাব।

শুনে রাজকন্যা বলল—প্রকৃত ভালবাসাই আমি এতদিন ধরে চাইছি। ফিন্‌কে বিয়ে করলে কি আমি পারব সুখী হতে?

—আয়ার্ল্যাণ্ডে ফিনের মত সর্বজনপ্রিয় লোক আর নেই।—একসঙ্গে বলে উঠলো গল আর ওইসিন্।

—আপনার কি মত, বাবা ?—গ্রানিয়া জিজ্ঞেস করে রাজাকে,—আপনারও কি ইচ্ছে, আমি ফিন্‌কে বিয়ে করি ?

—এ বিয়ে হলে আমি খুবই আনন্দিত হব গ্রানিয়া।—রাজা বললেন,—শুধু আমি নয় রাজ্যের সমস্ত প্রজাও আনন্দিত হবে কারণ তাহলে আমাদের অনেক দিনের ঝগড়া-বিবাদ মিটে যাবে।

রাজকুমারী রাজী হল ফিন্‌কে বিয়ে করতে। চোদ্দদিন পরে বিয়ের তারিখ ঠিক হল। গল ও ওইসিন্ আনন্দের সংবাদ নিয়ে ফিরে এল ফিনের কাছে।

বিয়ের দিন ফিন তার ফিন্না নিয়ে জাঁকজমকের সঙ্গে রাজপ্রাসাদ টিমহেয়ারে এলেন। রাজা খুব সমাদর করে সকলকে অভ্যর্থনা করলেন। কিন্তু ফিনের বৃদ্ধ বয়স আর মাথার পাকা চুল দেখে সুন্দরী গ্রানিয়ার মন দুঃখে ও হতাশায় ভরে গেল। একসময় রাজাকে সে বলল—বাবা, এই বুড়ো কিছুতেই আমার বর হতে পারে না।

রাজা বললেন—ফিনের বয়স কিছু বেশী হয়েছে আর চুলও পেকে গেছে বটে, কিন্তু ফিনের জ্ঞান অতুলনীয়, ক্ষমতা তার অসীম আর অতি মহৎ তার অন্তঃকরণ। দুঃখ কোরো না গ্রানিয়া, ফিন্‌কে বিয়ে করে তুমি অসুখী হবেনা। গ্রানিয়া আর কিছু বলল না।

বিবাহের ভোজ আরম্ভ হোলো। ফিনের পাশেই গ্রানিয়া বসেছে। ফিন তার প্রতি খুবই কোমল আর সরল ব্যবহার করছেন। কিন্তু গ্রানিয়ার থেকে থেকে কেবলই মনে হচ্ছে, ফিনের সঙ্গে বিয়ে হলে সুখের মুখ আর সে দেখতে পাবে না। সে ভাবতে থাকে, এই দুর্ভাগ্যের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় কিনা। বিরাট ভোজগৃহের চারিদিকে তাকিয়ে সে উপায় খুঁজতে থাকে। এমন সময় তার চোখ পড়ল একটি সুন্দর যুবকের উপর। গ্রানিয়া দেখল যুবকটিও

করুণ চোখে তার দিকেই চেয়ে রয়েছে। যুবকটি বসেছিল গল আর ওইসিনের মাঝখানে। ফিনের কাছে জিজ্ঞেস করে গ্রানিয়া জানতে পারল, যুবকটি ফিন্নারই একটি সভ্য। নাম তার ডায়ারমুড্। ফিন তাকে আরো বললেন যে ডায়ারমুডের গুণের সীমা নেই এবং ফিন্নার মধ্যে সে-ই সবার সেরা।

এদিকে, ভোজসভায় গ্রানিয়াকে দেখামাত্রই ডায়ারমুড্ও ভালবেসে ফেলল। কিন্তু আজই যে ফিনের সঙ্গে গ্রানিয়ার বিয়ে হয়ে যাবে। হায়, কিছু দিন আগেও যদি তুজনের দেখা হত!—বিষাদভরা মন নিয়ে ডায়ারমুড্ এই সব ভাবছিল। গ্রানিয়া আবার তাকাল ডায়ারমুডের দিকে। আবার তাদের চোখে চোখে মিলন হল। গ্রানিয়ার গাল তুটি লাল হয়ে উঠল।

নিজের অজান্তেই ডায়ারমুড্ তার কপালের উপরের চুলগুলো মুহূর্তের জন্য ঠেলে দিল পিছনের দিকে। অমনি দেবতা-দত্ত সেই প্রীতি-চিহ্নটি তার কপালের উপর জ্বলজ্বল করে উঠল। দাগটি বেরিয়ে পড়েছে বুঝতে পেরেই সে তখনই চুল দিয়ে আবার তাকে ঢেকে দিল বটে, কিন্তু ততক্ষণে গ্রানিয়া তা দেখে ফেলেছে। আর যেমনি দেখা, অমনি তার মনে ডায়ারমুডের প্রতি গভীর ভালবাসা জেগে উঠল।

ডায়ারমুড্কে ভালবেসে, গ্রানিয়া স্থির করল, ফিন্কে সে কিছুতেই বিয়ে করবে না। যেমন করেই হোক, সে ডায়ারমুড্কে নিয়ে পালিয়ে যাবে কোন দূর দেশে। মনে মনে সে এক তুঃসাহসিক মতলব আঁটল। একজন দাসীকে ডেকে সে আদেশ দিলে—আমার কক্ষে যে সোনার পান-পাত্র আছে, তাকে পানীয়পূর্ণ করে নিয়ে এস। দাসী আদেশ পেয়ে চলে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পানীয়পূর্ণ পানপাত্রটি নিয়ে ফিরে এল। পানপাত্রটি এত বড় যে ভোজ সভায় উপস্থিত সকলকে পরিবেশন করলেও পানীয় ফুরোবে না। গ্রানিয়া অতি গোপনে সেই পানীয়ের সাথে একটি অব্যর্থ ঘুমের ওষুধ

মিশিয়ে দিল। তারপর ডায়ারমুড্‌কে চিনিয়ে দিয়ে চুপি চুপি দাসীকে বলল—ওকে ছাড়া আর সবাইকে এই পানীয় পরিবেশন কর। দাসী তাই করল। সকলকেই সে ঐ পানীয় পরিবেশন করল, করল না কেবল ডায়ারমুড্‌কে। ডায়ারমুড্ বসে বসে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, দাসী শুধু তাকেই বাদ দিল কেন !

পানীয় পান করে অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজা, ফিন্, গল, ওইসিন্ এবং অন্যান্য সকলেই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। বিরাট ভোজ-সভায় শুধু দুটি প্রাণী জেগে রইল—গ্রানিয়া আর ডায়ারমুড্। রাজকুমারী গ্রানিয়া তখন আসন ছেড়ে এসে দাঁড়াল ডায়ারমুডের আসনের পাশে। কোমল, করুণ কণ্ঠে গ্রানিয়া বলল—ডায়ারমুড্ তুমি আমায় বিয়ে কর। আমি তোমায় ভালবেসেছি। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করব না।

ডায়ারমুড্ বললে—রাজকুমারী, এখন আর আমার কিছু বলার নেই, কারণ অনেক আগেই ফিনের সাথে তোমার বিয়ে স্থির হয়েছে। ফিন্ আমার আত্মীয়। সুতরাং তোমাকে বিয়ে করা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

রাজকুমারী গ্রানিয়া বললে—ফিন্‌কে আমি কখনও বিয়ে করব না, কিছুতেই না। যতদিন বাঁচব, শুধু তোমাকেই ভালবাসব।

ডায়ারমুড্ উত্তর করল—আমিও তোমায় খুবই ভালবেসেছি গ্রানিয়া, কিন্তু দলপতির প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। গ্রানিয়া বলল—বেশ, তাহলে আমার আর একটি প্রার্থনা আছে।

ডায়ারমুড বলল—বল কি তোমার প্রার্থনা। যদি সম্ভব হয়, আমি জীবন দিয়ে সে প্রার্থনা পূর্ণ করব।

রাজকন্যা কাতর হয়ে বলল—শুধু ফিনের কাছ থেকে দূরে—

বহু দূরে—যতদূরে পার আমায় নিয়ে চল। ফিন্‌কে বিয়ে করার চেয়ে, মরে যাব সেও বরং ভাল।

রাজকুমারীর আকুলতা দেখে ডায়ারমুড্ মনে মনে খুবই দুঃখিত হল, কিন্তু তখনই তার মনকে দৃঢ় করে সে বলল—তুমি যা করতে বলছ রাজকুমারী, সে অতি কঠিন কাজ। প্রথমতঃ আত্মীয়ের ভাবী বধূকে চুরি করে পালিয়ে যাওয়া মহাপাপ—সে আমি পারব না। দ্বিতীয়তঃ তোমায় এখান থেকে নিয়ে গেলেও বিয়ে আমি কিছুতেই করব না।

রাজকুমারী কেঁদে ফেলল—তুমি আমায় কথা দিয়েছ জীবন দিয়েও আমার প্রার্থনা পূর্ণ করবে। কথা দিয়ে কথা রাখবে না ডায়ারমুড্! এই কি বীরের ধর্ম ?

রাজকন্যার কথা শুনে আর তার চোখে জল দেখে ডায়ারমুড্ সত্যিই এবার বিচলিত হয়ে পড়ল। দুঃখের সঙ্গে বলল—গ্রানিয়া, কেন মিছে দুঃখকে বরণ করছো ?

—তুমি যদি আমার রক্ষার ভার নাও ডায়ারমুড্, তাহলে যতদিন ফিনের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে থাকতে পারব, ততদিন কোন দুঃখই দুঃখ নয়।—আগ্রহের সঙ্গে বলল গ্রানিয়া।

—বেশ তাই হোক তবে।—বলল ডায়ারমুড্।

—তাহলে আর একমুহূর্ত দেরী নয়। চল আমরা পালাই।—ডায়ারমুডের দিকে চেয়ে বলল গ্রানিয়া।

ভোজঘরে সবাই ঘুমিয়ে আছে। গ্রানিয়া আর ডায়ারমুড্ দ্রুতপদে বেরিয়ে এল সে ঘর থেকে। সবাই জেগে ওঠার আগেই যতটা পারা যায় এগিয়ে যেতে হবে তাদের। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই গ্রানিয়া ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল। তাকে ক্লান্ত দেখে ডায়ারমুড্ আবার তাকে ফিরে যেতে অনুরোধ করল। গ্রানিয়াকে সে বোঝাবার চেষ্টা করল যে ফিনের রাগ থেকে লুকিয়ে বেড়ান যেমনি কঠিন হবে, তেমনি হবে বিপজ্জনক। সুখ, সম্পদ আর ঐশ্বর্যের

মাঝে লালিত পালিত হয়েছে গ্রানিয়া! তার পক্ষে এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়।

গ্রানিয়া শুনল না তার কথা। সে বলল যে ডায়ারমুড্‌কে ছেড়ে সে কিছুতেই ফিরে যাবে না তার পিতার রাজপ্রাসাদে। ডায়ারমুড্‌ আর কি করবে! গ্রানিয়াকে নিয়ে আবার চলতে লাগল। দিন ফুরিয়ে গেল। চারিদিক অন্ধকারে কালো করে রাত্রি যখন নেমে এল, তখন তারা রাজপ্রাসাদ হতে অনেক দূরে এসে পড়েছে। কোথায় রাত কাটাবে এই হল এখন তাদের একমাত্র চিন্তা। ডায়ারমুড্‌ এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে কাঠের বেড়া দেওয়া একটা জায়গা দেখতে পেল। তখনি সে তাড়াতাড়ি গাছের কচি কচি ডাল ভেঙে আর নরম ঝোপের ডগা দিয়ে গদির মত একটা বিছানা তৈরি করল। তারপর গ্রানিয়ার দিকে চেয়ে বলল—এই পাতার বিছানায় শুয়ে তুমি নির্ভয়ে ঘুমোও গ্রানিয়া। সমস্ত অনিষ্টের হাত থেকে তোমায় রক্ষার ভার আমি নিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রানিয়া ঘুমিয়ে পড়ল। তার আর ভয় কি? ডায়ারমুড্‌ তাকে পাহারা দিচ্ছে জেগে। আর ডায়ারমুড্‌ পাতার বিছানায় নিদ্রিত রাজকন্যার মুখের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল—একি দুঃখের জীবন আরম্ভ হল তাদের—ফিন্‌ কিভাবে এর প্রতিশোধ নেবে।

[২]

এদিকে ফিন্‌ মায়াঘুম থেকে জেগে উঠে দেখল যে ডায়ারমুড্‌ গ্রানিয়াকে নিয়ে টিমহেয়ার থেকে পালিয়েছে। এতে তার যেমনি দুঃখ হল তেমনিই হল রাগ। সে রাগে চিৎকার করে বলতে লাগল—শয়তান ডায়ারমুড্‌ আমায় প্রতারণা করেছে। নিশ্চয়ই আমি এর প্রতিশোধ নেব। ওকে আমি মেরে ফেলব।

ফিনের জন্যে কবি ওইসিনের খুবই দুঃখ হল। কিন্তু ডায়ারমুড্‌কে

সে ভালবাসত খুবই। তাই ফিনের আক্রোশ দেখে সে বলল—হে মহান্ ফিন্, আপনার মত লোকের প্রতিশোধের কথা বলা উচিত নয়। আমার অনুরোধ, আপনি ডায়ারমুড্‌কে ক্ষমা করুন। ফিন্ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উত্তর দিল,—কেন, কিসের জন্য ঐ শয়তানকে ক্ষমা করব? সে আমার প্রতি নির্দয় অবিচার করবে, আর আমি তাকে সুখে বাস করতে দেব?

কোমল স্বরে ওইসিন্ বলল,—ডায়ারমুড্ আপনার প্রতি অন্যায় করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন হতে পারে যে এ অন্যায় সে ইচ্ছা করে করেনি। তার কপালের সেই প্রীতি-চিহ্নই হয়ত এজন্য দায়ী।

—তাও যদি হয়, কেন সে বিশ্বাসঘাতকতা করল?—ফিনের কণ্ঠ কঠোর হয়ে ওঠে।—পুত্রের মত তাকে স্নেহ করেছি, আর সেই কিনা হল বিশ্বাসঘাতক। প্রভুর ভাবী পত্নীকে চুরি করল। না ওইসিন্, ক্ষমার কথা আমায় বোলো না। শাস্তি ওকে পেতেই হবে—আর সে হবে অতি কঠিন শাস্তি—মরতে ওকে হবেই।

তখন ফিনের অধীনে এমন কতকগুলি লোক ছিল যারা পলাতকদের পায়ের চিহ্ন ধরে অতি অনায়াসেই তাদের গুপ্তস্থান বের করতে পারত। ক্রোধোন্মত্ত ফিন তাদের আদেশ দিলেন যেমন করেই হোক, আর যতদিনেই হোক ডায়ারমুড্ আর গ্রানিয়া কোন্ দেশে কোথায় লুকিয়ে আছে তা জেনে দিতে হবে। ফিনের আদেশ পেয়ে তারা ছুটল পায়ের চিহ্ন পরীক্ষা করে করে দেশবিদেশে। রাগে দুঃখে ফিন সেইদিন থেকে সকলের সঙ্গেই বাক্যালাপ বন্ধ করে দিলেন। নিজের তাঁবুর ভিতর তিনি একাকী বাস করতে লাগলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন যতদিন ডায়ারমুড্ বেঁচে থাকবে, ততদিন তিনি আর কারও সঙ্গে কথা বলবেন না।

ফিন্নার কেউ কেউ বলতে লাগল যে ডায়ারমুড্ তাদের দলপতির প্রতি যে অন্যায় করেছে তার একমাত্র শাস্তি—মৃত্যু। আবার যারা

ডায়ারমুড্‌কে ভালোবাসত তারা বলতে লাগল যে যে যাই বলুক না কেন ফিনের চেয়ে ডায়ারমুড্‌ই গ্রানিয়ার যোগ্য বর। তারা মনে মনে কামনা করতে লাগল গ্রানিয়া আর ডায়ারমুড্‌ যেন ধরা না পড়ে। কিন্তু তাদের আশা পূর্ণ হ'ল না। কিছুদিনের মধ্যেই খবর এল। পশ্চিমে ডয়র-ডা-বোথ নামে এক বনভূমি আছে; তারা লুকিয়ে আছে সেই বনের মাঝে। খবর পেয়েই ফিন্‌ লোকজন নিয়ে ছুটল সেই বনের দিকে।

ফিন্‌ যখন লোকজন নিয়ে তৈরি হচ্ছিল, কবি ওইসিন্‌ তখন বীর গলকে চুপিচুপি বলল—ডায়ারমুড্‌ ধরা পড়বে আর এই বয়সেই তাকে ফিনের হাতে জীবনটা দিতে হবে—এ ভাবতে সত্যিই দুঃখ হচ্ছে। আচ্ছা, আমরা কি তাকে বাঁচাতে পারিনে?

—তা পারি বইকি।—একটু চিন্তা করে উত্তর করলে গল—বার্ণকে যদি ছেড়ে দিই তবে সে ঠিক খুঁজে বের করবে ডায়ারমুড্‌কে। বার্ণকে দেখতে পেলেই ডায়ারমুড্‌ বুঝতে পারবে যে ফিন্‌ তার পিছু নিয়েছে। তাহলেই সে গ্রানিয়াকে নিয়ে আর কোথাও চলে যেতে পারবে। ফিন্‌ তাকে আর ধরতে পারবেনা। ফিনের একটি প্রিয় কুকুর ছিল। তারই নাম বার্ণ। বার্ণ ডায়ারমুড্‌কে ভালবাসত ফিনের চেয়েও বেশী।

গল ও ওইসিন্‌ গোপনে বার্ণকে তাদের কাছে ডেকে ডায়ারমুডের একটি পোশাক দেখাতেই সে বুঝতে পারলো কেন তাকে ডাকা হয়েছে, কি করতে হবে তাকে। এরকম শিক্ষিত কুকুর তখনকার দিনেও খুব বেশী ছিলনা। ফিনকে লুকিয়ে বার্ণ বেরিয়ে পড়ল ডায়ারমুডের খোঁজে। গন্ধ শুঁকে শুঁকে সে ছুটতে লাগলো। সে যেন বুঝতে পেরেছে ডায়ারমুডের বিপদ। রাতের পর দিন—দিনের পর আবার রাত সে ছুটতে লাগল। কোথাও সে থামল না এক মুহূর্ত। ওস্তাদ কুকুর অবশেষে ডয়র-ডা-বোথে গিয়ে হাজির হ'ল। রাত হ'য়েছে তখন। গ্রানিয়া একটি ছোট কুটিরের মধ্যে ঘুমোচ্ছে। ডায়ারমুড্‌ কুটিরটির

চারিদিকে খুব শক্ত বেড়া দিয়ে দিয়েছিল। ফিন্ যাতে অতর্কিতে তাদের উপর এসে পড়তে না পারে, এজন্য সে প্রত্যহ রাত জেগে কুটিরের চারিদিকে পাহারা দিত। কিন্তু রাত জেগে জেগে আজ সে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বেশীক্ষণ জেগে থাকতে পারলনা—ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়ে। বার্ণ তো তাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে চিৎকার করতে লাগল। কিন্তু ডায়ারমুড্ এতই ক্লান্ত হয়েছিল আর এত গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছিল যে বার্ণের বারবার চিৎকারেও ঘুম তার ভাঙল না কিছুতেই।

ভোরের আলোয় চোখ মেলে যখন ডায়ারমুড্ দেখল যে তার প্রিয় কুকুর বার্ণ তার পাশে বসে তার দিকে চেয়ে আছে, সে খুবই অবাক হয়ে গেল। আর একথাও তার বুঝতে দেরি হলনা যে ফিন্ তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসছে। ডায়ারমুড্ কুকুরটিকে কিছুক্ষণ আদর করল—তাকে খাবার আর জল খেতে দিল, তার পর কুটিরের ধারে গিয়ে কোমল স্বরে ডাকল—গ্রানিয়া শীগ্‌গীর ওঠো। ফিন্ এগিয়ে আসছে। ভয়ে ভাবনায় গ্রানিয়া লাফিয়ে উঠল বিছানা থেকে। ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ডায়ারমুড্‌কে—কি করে জানলে তুমি?

এই দেখ ফিনের প্রিয় কুকুর বার্ণ। ও আমায় ভালবাসে ফিনের চেয়েও বেশী। ফিন্ যে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে, সেই কথাটি জানাবার জন্যই কেউ বোধহয় ওকে পাঠিয়েছে আগে থেকে। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

—দেরি হয়েছে, কেন বলছো?—ভয়ে গ্রানিয়ার বুক দুরু দুরু করতে লাগল।

—ঐ দেখ, দূরে দেখা যাচ্ছে একদল লোক এদিকেই এগিয়ে আসছে। ওরা ফিন্ আর তার ফিন্না না হয়ে যায়না।—ডায়ারমুড্ চিন্তিতভাবে বলল।

—তাহলে আর দেরি করোনা ডায়ারমুড্। শীগ্‌গীর চল পালিয়ে যাই।—গ্রানিয়ার মনের ভয় তার মুখে চোখে ফুটে উঠলো।

ডায়ারমুড্ প্রথমে কিছুই বলল না। যেন একেবারেই হতাশ হয়ে পড়েছে এমনিভাবে মাথা নাড়ল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কি যেন সে ভেবে নিল। তারপর গ্রানিয়ার দিকে চেয়ে বলল—গ্রানিয়া, একি দুর্ভাগ্য তুমি বরণ করে নিলে। আমার সঙ্গে এ দুঃখের জীবন যাপন করে লাভ কি বলতো ? তার চেয়ে তুমি তোমার পিতার কাছে ফিরে যাও। সেই ভাল হবে। এস, আমরা দুজনেই ফিনের সম্মুখীন হই। ফিন্ যদি কথা দেয় তোমাকে কোনরূপ কষ্ট না দিয়ে টিমহেয়ারে পৌঁছে দেবে, তাহলে আমাকে সে যে শাস্তিই দিক না কেন আমার দুঃখ নেই।

গ্রানিয়া ডায়ারমুডের কথায় রাজী হল না কিছুতেই। তার দুটি চোখ জলে ভরে গেল।

এখন হয়েছে কি, প্রেমের দেবী এঙ্গাস ডায়ারমুডকে ভালবাসতেন—ঠিক যেমন মা তার ছেলেকে ভালবাসেন। যখন গ্রানিয়া আর ডায়ারমুডে কথা হচ্ছিল, এঙ্গাস তার অদৃশ্য প্রাসাদে বসে সবই জানছিলেন। তাঁর পুত্রসম প্রিয় ডায়ারমুড্ বিপদে পড়েছে দেখে তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠল। তিনি আর অদৃশ্য প্রাসাদে লুকিয়ে থাকতে পারলেন না। ডায়ারমুড্‌কে সাহায্য করার জন্য ছুটে এলেন মর্ত্যলোকে—স্বর্গের প্রাসাদ ছেড়ে।

এদিকে গ্রানিয়াকে কিছুতেই বোঝাতে না পেরে ডায়ারমুড্ বললে—তাহলে আর কি বলব। এখন একমাত্র প্রেমের দেবী এঙ্গাসই আমাদের বাঁচাতে পারেন। ডায়ারমুডের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এঙ্গাস এসে দাঁড়ালেন তাদের সামনে। বললেন—ফিনের প্রতি যদিও তুমি অবিচার করেছ ডায়ারমুড্, তবু তুমি আমার অতি প্রিয়। আমি তোমায় ফিনের ক্রোধ থেকে বাঁচাব। এঙ্গাসকে দেখে

গ্রানিয়ার আনন্দের আর সীমা রইল না। সে এঙ্গাসের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে জোড়হাতে বলতে লাগল—হে দেবী, তুমি আমাদের রক্ষা কর।—আর ভয় করো না গ্রানিয়া। আমি তোমাদের দুজনকেই আমার অদৃশ্যলোকে লুকিয়ে রাখবো। কেউ তোমাদের আর দেখতে পাবে না।—এঙ্গাসের স্বরে যেন করুণা ঝরে ঝরে পড়তে লাগলো। —ডায়ারমুড্ এঙ্গাসকে জানাল যে সে এখন তাঁর সঙ্গে যেতে চায়না। যদি বেঁচে থাকে তবে পরে সে তাদের সঙ্গে গিয়ে মিলবে। দেবী দয়া করে গ্রানিয়াকে নিয়ে গেলেই সে খুশী। ডায়ারমুডের কথা শুনে ভীতকণ্ঠে গ্রানিয়া জিজ্ঞেস করল—তুমি একা এখানে থেকে কি করবে ডায়ারমুড্?

—আমি এখন ফিনের সম্মুখীন হব। গর্বিত স্বরে উত্তর দেয় ডায়ারমুড্।—তোমার জন্য আর আমার চিন্তার কারণ নেই। দেবী তোমার ভার নিয়েছেন। এবার আমি একবার ফিন্ এবং তার ফিন্নার মুখোমুখি হতে চাই। যদিও তারা আমার শত্রু হিসাবেই এখন আমাকে ধরতে আসছে।

—বেশ, তাই হোক—দেবী বললেন—গ্রানিয়াকে আমি সমস্ত অনিষ্টের হাত থেকে রক্ষা করব। আমরা এখান থেকে পশ্চিমে রস্-ডা-সয়লিস নামক জায়গায় তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

ডায়ারমুড্‌কে একাকী বিপদের মুখে ফেলে যেতে গ্রানিয়ার মন চাইছিল না। সে কাঁদতে লাগল আর অনুযোগ করতে লাগল। ডায়ারমুড্ বলল—ভুল বুঝো না গ্রানিয়া। আমি আমার সম্মান হারিয়েছি, মনে আমার শান্তি নেই। ফিনের প্রতি আমি অন্যায় করেছি—সে কথা আমি ভুলতে পারছিনা—দিনে রাতে। আমার জন্য ভেব না। যদি বেঁচে থাকি ফিরে আসব। কিন্তু ফিনের সঙ্গে বোঝাপড়া আমায় করতেই হবে। প্রেমের দেবী এঙ্গাস তাঁর মায়া-চাদরে গ্রানিয়াকে ঢেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ফিন্ আর তার দলবলকে এবার স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। বেশ নিকটেই এসে পড়েছে তারা। গ্রানিয়াকে রক্ষা করবার জন্য ডায়ারমুড্ যে বেড়া নির্মাণ করেছিল, তার সাতটি দরজা ছিল। ফিন্ নিশ্চয়ই ওর যে কোন একটা দিয়েই ঢুকবে মনে করে, ডায়ারমুড্ দুহাতে দুটো বর্শা নিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। মনে মনে বলল—ফিন্ যে দরজা দিয়ে ঢুকবে আমিও সে দরজা দিয়েই বেরোব। তাহলেই উভয়ের মধ্যে বোঝাপড়াটা ঠিক হবে।

ফিন্ তার লোকজন নিয়ে চিৎকার করতে করতে এসে পড়ল। ফিনের লোকেরা বেড়ার চারদিক ঘিরে ফেলল।—সাবধান, সকলেই সতর্ক থেকো। শয়তান ডায়ারমুড্ যেন কোনরকমে পালাতে না পারে। সে আর গ্রানিয়া নিশ্চয়ই এখানে আছে।—ফিন্ আদেশ দিল।

ভিতর থেকে ডায়ারমুড্ চেঁচিয়ে বলল—গ্রানিয়াকে আর পাবেনা, ফিন্। সে চলে গেছে। কিন্তু আমি আছি। আমিই করব তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া।

এই বলে প্রথম দরজার কাছে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল—বাইরে কে আছ? উত্তর এল—আমি কবি ওইসিন্। শীগ্‌গীর বেরিয়ে এস ডায়ারমুড্। আমি তোমায় ভালবাসি। তোমায় আমি যেতে দেব। এই দরজা দিয়ে এখনি পালাও।—বন্ধু ওইসিন্।—ডায়ারমুড্ বলল—সে হবার নয়। এ দরজা আমার পালাবার উপযুক্ত পথ নয়। দ্বিতীয় দরজায় দেখা হল গলের সাথে। গলও তাকে সেই দরজা দিয়ে পালাতে বলল। ডায়ারমুড্ ওইসিন্‌কে যে উত্তর দিয়েছিল গলকেও সেই উত্তরই দিল। ক্রমে ক্রমে ছয়টি দরজায়ই দেখা গেল তার বন্ধুরাই দাঁড়িয়ে আছে। সকলেই তাকে অনুরোধ করতে লাগল—পালাও, ডায়ারমুড্, পালাও। কিন্তু ডায়ারমুড্ পালালো না। সে আজ, ফিনের সামনে দাঁড়াবেই।

ডায়ারমুড্ সপ্তম দরজায় গেল। দরজার বাইরে ফিনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে "এই যে আমি" বলে দরজা খুলে সে বেরিয়ে এল। ফিন্ তাকে ধরবার জন্য প্রস্তুতই ছিল, কিন্তু হাতের বর্শার উপর ভর দিয়ে ডায়ারমুড্ এত জোরে লাফ মারল যে ফিন্‌কে ডিঙিয়ে অনেকটা দূরে গিয়ে সে পড়ল। ফিন্ আর তার লোকজন কাজেই তাকে আর ধরতে পারল না। ডায়ারমুড্ মুহূর্তে চোখের আড়াল হয়ে গেল। দৌড় প্রতিযোগিতায় ডায়ারমুড ই ছিল ফিন্নাদলের সেরা। ফিন্ এবং তার ফিন্নাদের অনেক পিছনে ফেলে সে এগিয়ে গেল পশ্চিমদিকে। রস্-ডা-সয়লিসে পৌঁছে তবে সে থামল।

সেখানে একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে এঙ্গাস আর গ্রানিয়া তার জন্য অপেক্ষা করছিল। তাকে ফিরে আসতে দেখে উভয়েই খুব আনন্দিত হোলো। এঙ্গাস বললো—এস তিনজনে কিছু খেয়ে নিই। খেতে খেতে ডায়ারমুড্ কি করে ফিন্ আর তার লোকজনদের বোকা বানিয়ে চলে এসেছে, তা বলতে লাগল। খেয়ে দেয়ে তারা রাতের মত ঘুমিয়ে পড়ল। আর তাদের ভয় নেই। ফিন্ আর তার ফিন্না এখন বহুদূরে।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে এঙ্গাস বললেন—এবার আমায় যেতে হবে। বিপদে পড়লে আমায় স্মরণ কোরো।—আমি তোমাদের রক্ষা করব। যেখানেই থাকো, ফিন্ তার লোকজন নিয়ে তোমাদের অনুসরণ করবেই। খুব সাবধান।

ডায়ারমুড্ যতক্ষণ সঙ্গে আছে, আমার আর ভয় কি?—গ্রানিয়া বলল।

—নিশ্চয়ই। ডায়ারমুড্ বীর। সে তোমায় রক্ষা করবে। তবে তোমাদের বলে যাচ্ছি যতদিন ফিন্ তোমাদের পিছু নেবে ততদিন একগুঁড়িওয়ালা গাছের ফোকরে অথবা একটি মাত্র দরজাওয়ালা গুহায় ঢুকবে না। যে দ্বীপে একটির বেশী পোতাশ্রয় নেই সে দ্বীপে আশ্রয়

নেবে না। আর যেখানে রাঁধবে, সেখানে খাবেনা—অন্যত্র খাবে ; যেখানে খাবে, সেখানে কখনও শোবে না। তা যদি করো তো বিপদ হবে।—এইসব উপদেশ দিয়ে প্রেমের দেবী এঙ্গাস দেখতে না দেখতে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। ডায়ারমুড্ আর গ্রানিয়াও রস্-ডা-সয়লিস ত্যাগ করে চলতে লাগল পশ্চিম দিকে—দূর থেকে দূরে।

[৩]

দিনের পর দিন চলে যেতে লাগল॥ ডায়ারমুড্ আর গ্রানিয়ার বিশ্রামের অবসর নেই। যেখানেই যায় ফিন্ তাদের পিছু নেয়। ওদের ধরবার জন্য মতলবের শেষ নেই তার। ডারারমুড্ যতই তার মতলবকে ব্যর্থ করে দেয়, ফিনের রাগ ততই যায় বেড়ে। সে আরও ভীষণতর মতলব আঁটতে থাকে। বড়ই কষ্টে দিন কাটে ডায়ারমুড্ আর গ্রানিয়ার। কখনো খেতে বসেছে, ফিনের লোক এসে করল তাড়া। খাওয়া আর হয়না—খাবার ফেলে রেখে ছুটতে হয়। ঘুমে চোখ ঢুলে পড়ছে, ঘুমোতে যাবে, ফিন্ তার দলবল নিয়ে হাজির। ঘুম আর হয় না—তন্দ্রালু চোখে দিশেহারা হ'য়ে ছুটতে থাকে তারা। কখনও বা শুধু গাছের ডাল আর পাতা খেয়েই তাদের কাটাতে হয় সারা দিন, সারা রাত।

এমনি কষ্টের ভিতর দিয়েই পালিয়ে পালিয়ে তারা এসে উপস্থিত হল ডুভ্রস নামক এক বনের মধ্যে। খুবই মনোরম আর আরামদায়ক স্থান এই বনটি। গাছগুলিতে যেন ফলের হাট বসেছে। ঝোপগুলিতে রঙবেরঙের ফুল ফুটে রয়েছে। পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে একটি নদী। স্বচ্ছ তার জল ; শান্ত, মধুর তার কলধ্বনি। স্থানটি গ্রানিয়ার খুবই ভাল লাগল। সে বলল—ডায়ারমুড্, এস, আমরা এখানেই কুটির বাঁধি। এখানে নিশ্চয়ই শত্রুরা আমাদের খুঁজে পাবেনা। তাছাড়া কি সুন্দর জায়গা। আমার মনে হয় সমস্ত জীবন আমি এখানে কাটিয়ে দিতে পারি।

ডায়ারমুডেরও ভালই লেগেছিল বনটি। সে রাজী হল। একটা খুব বড় ফার গাছের তলায় ডায়ারমুড্ আগুন জ্বাললো। তারপর নদী থেকে মাছ ধরে নিয়ে এল। গ্রানিয়া মাছটিকে শিকের উপর রেখে সিদ্ধ করল। তারপর দুজনে খেতে বসল। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে—ধীরে ধীরে নদীর ওপারের ঐ গাছগুলির পিছনে কি সুন্দর পাখীগুলি সন্ধ্যারাণীর আগমনী গেয়ে ফিরে চলেছে যে যার কুলায়। কি মিষ্টি ওদের গান। খাওয়া শেষ করে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে গ্রানিয়া বলল—আঃ, চিরদিন যদি এই বনে থাকতে পাই। টিমহেয়ার থেকে পালিয়ে আসা অবধি এমন শান্তি আর পাইনি কোথাও। এ বন যেন জাদু জানে, আমায় মুগ্ধ করেছে।

—কিন্তু এ জায়গাও ছাড়তে হবে গ্রানিয়া। দেবী এঙ্গাসের কথা ভুলে যেওনা। এখানে আমরা বসে খেয়েছি, কাজেই এখানে বিশ্রাম করা চলবেনা।—বলল ডায়ারমুড্।

ক্লান্তিতে গ্রানিয়া আর চলতে পারছিল না। ডায়ারমুড্ তাকে কোলপাঁজা করে নিয়ে এল গভীর বনের মধ্যে। তারা যেখানে এসে থামল, সেখানে ছিল প্রকাণ্ড এক আতাফলের গাছ। পাকা পাকা ফলগুলির মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে। আর ফলগুলি কত বড় বড়। এত বড় আতাফল তারা এর আগে দেখেনি কখনও। আনন্দে হাততালি দিয়ে গ্রানিয়া বলে উঠল—ডায়ারমুড্, কয়েকটা ফল পেড়ে নিয়ে এসো না।

কিন্তু যেমনি ডায়ারমুড্ ফল পাড়তে গিয়েছে, অমনি একটা কর্কশ স্বর সে শুনতে পেল—সাবধান, ফল পাড়লে বিপদ হবে।

স্বর শুনে ডায়ারমুড ও গ্রানিয়া দুজনেই উপরের দিকে তাকাল। নীচের দিকে মাথা দিয়ে গাছের উপর থেকে নেমে আসছে একটা খুব কুৎসিৎ আর বিরাট চেহারার মানুষ। তার হাতে আবার একটা প্রকাণ্ড গদা। তার চোখও একটা, তাও আবার কপালের মাঝখানে—আগুনের

মত জ্বলছে যেন। তার গায়ের রঙ রাত্রির অন্ধকারের চেয়েও কালো। আর প্রকাণ্ড মুখের ভেতর থেকে বড় বড় বাঁকা বাঁকা দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে। এত কদাকার আর ভীষণ তার চেহারা যে গ্রানিয়া ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

সেই বিকট মুখে হাঁ করে কঠোর স্বরে মানুষটা আবার বলল—কে তোরা, এই বনে ঢোকবার সাহস রাখ?

ডায়ারমুড্ তাদের সমস্ত ঘটনাই বলল প্রথম থেকে। কিছুই বাদ দিল না। ফিন্ যে তাদের এখনও তাড়া করে ফিরছে, ঘন বন ছাড়া তাদের যে আর পালিয়ে থাকবার জায়গা নেই, সে কথাও বলল।

শুনে লোকটা বলল ফিন্‌কে আমিও দেখতে পারি নে। সে আমারও শত্রু। তা যদি না হত, আমি তোদের এক্ষুনি মেরে ফেলতুম। তা বেশ, তোরা এখানে থাকতে পারিস। কিন্তু সাবধান, কখনও আতা গাছের কাছে ঘেঁষবি না যেন—তাহলে কিন্তু ভাল হবে না বলে রাখছি।

ডায়ারমুড্ ও গ্রানিয়া কি আর করে—লোকটার কথায় রাজী হয়ে গেল।

ডায়ারমুড্ লোকটাকে জিজ্ঞেস করল—তুমি কে? আর কেনই বা এই বনের মধ্যে এই আতা গাছটাকে পাহারা দিচ্ছ?

—আমার নাম সিয়ারভন। দেবতাদের আদেশে আমি এই আতা গাছটাকে পাহারা দিচ্ছি। এ গাছের ফল শুধু দেবতারা খাবেন। তাদের ইচ্ছে নয় যে কোন মানুষ এর স্বাদ পায়।

—তা দেবতাদের গাছ স্বর্গে না থেকে, এই মানুষের পৃথিবীতে এল কি করে? জিজ্ঞেস করল ডায়ারমুড্।

—দেবতারা একদিন ভ্রমণ করছিলেন ডুভ্রসের বনপ্রদেশে। দৈবক্রমে একটি স্বর্গীয় আতাফল পড়ে গেল পৃথিবীর মাটিতে। তা

থেকেই হ'য়েছে এই গাছটা। এর ফলের এমনই গুণ যে, যে খাবে তার আর জীবনে কোনও অসুখ হবে না, বুড়ো হবেনা কখনও সে। একেবারে অজর অমর হয়ে দেবতাদের সমান হয়ে যাবে। শুধু তাই-ই নয়, কোন মেয়ে যদি খায় এ ফল, তার রূপ হবে অতুলনীয়, আর সে রূপ মলিন হবে না কখনও। এমনটা যে হয়েছে, দেবতারা প্রথমে তা জানতে পারেন নি। যখন তাঁরা জানলেন যে স্বর্গের ফল মাটিতে পড়ে গাছ হয়েছে, আর তার ফল খেয়ে মানুষগুলো বেমালুম দেবতা বনে যাচ্ছে, তাঁদের ক্রোধের আর সীমা-পরিসীমা থাকল না। তাঁরা আমায় ডেকে বললেন—সিয়ারভন, তোমার ওপর ভার রইল, যেন এর একটি ফলও মানুষে আর ছুঁতে না পারে। সেই দিন থেকে আমি গাছটাকে পাহারা দিচ্ছি—কি দিন, কি রাত।

এই বলে সিয়ারভন একটু থামল। তারপর ভয় দেখানোর ভঙ্গীতে হাতের গদাটাকে বার কয়েক ঘুরিয়ে সে বলল—দেখছিস তো এই গদা। আতা ছুঁয়েছিস কি, অমনি এর এক ঘায়ে মাথার ঘিলু বের করে দেব। সাবধান হ'য়ে থাকিস।

সিয়ারভন আবার মাথাটা নীচু দিকে দিয়ে, হাত আর পা দিয়ে গাছটা বেয়ে বেয়ে, গাছটার মাথায় চলে গেল। ডায়ারমুড্ আর গ্রানিয়া কিছুক্ষণ বনের মাঝে ঘুরে ঘুরে বনের শোভা দেখল। তারপর সুন্দর তৃণাচ্ছাদিত একটি জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে পড়ল দু'জনে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল ডায়ারমুড্, কিন্তু গ্রানিয়ার চোখে ঘুম নেই। সে শুয়ে শুয়ে চেয়ে রইল নীল আকাশের সোনালী তারাদের দিকে।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ডায়ারমুড্ দেখল গ্রানিয়া একটুও ঘুমোয় নি। সারারাত জেগে মুখখানা তার মলিন হয়েছে। চোখ-দুটিতে পড়েছে কালো দাগ। গ্রানিয়ার দিকে চেয়ে ডায়ারমুড্ ভয় পেয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল—গ্রানিয়া, অসুখ করেছে কি?

গ্রানিয়া শুধু বলল—না। গ্রানিয়ার মুখে আগের সে হাসি নেই —চোখের চাউনি উদাস—আর কেমন যেন মনমরা ভাব। দেখে শুনে ডায়ারমুডের চিন্তার শেষ নেই। কি হল গ্রানিয়ার। ডায়ারমুড্ থেকে থেকেই তাকে নানারকম প্রশ্ন করে। কখনও জিজ্ঞেস করে, তোমার মুখ কেন ম্লান ? কখনও শুধোয়, চোখ কেন ভারী। এমনি আরও কত প্রশ্ন করে সে, কিন্তু গ্রানিয়া উত্তর দেয়না। এমনি ভাবে কেটে যায় সারা দিন। সূর্য তখন পাটে বসেছে, ডায়ারমুড্ ও গ্রানিয়া খেতে বসল। খেতে খেতে ডায়ারমুড্ দুঃখের সঙ্গে বলল—আমায় তোমার মনের কথা বলবে না গ্রানিয়া ? ডায়ারমুডের দুঃখ দেখে গ্রানিয়ার মনেও এবার খুব দুঃখ হল। ডায়ারমুড্‌কে সে বলল তার মনের কথা। বলল—ডায়ারমুড্, অনেক কষ্টই আমি তোমাকে দিয়েছি। আমার জন্য তুমি আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলকে ছেড়ে এসেছ। বিজয়ী বীর ফিন্‌কে তোমার শত্রু করেছ—জীবনের সুখ, সম্পদ ত্যাগ করে পলাতকের দুঃখময় জীবন যাপন করছ।

এসব কথা আজ কেন বলছ গ্রানিয়া। এসব তো আমি কষ্ট বলে মনে করি না। এসব কথা থাক, তুমি আজ এত মন-মরা হ'লে কেন, তাই শুধু বল।—ডায়ারমুড্ বলল।

—না, না, ডায়ারমুড্, আমি যা চাই তা পেতে হ'লে তোমায় আরও কষ্ট পেতে হবে।—বলল গ্রানিয়া।

—তা হোক, তুমি বল,—ডায়ারমুড্ অনুরোধ করে। শেষে আবার বলে—আমায় যদি না বলো, আমি আত্মহত্যা করব গ্রানিয়া।

গ্রানিয়া তখন বলতে লাগল—কি বলব ডায়ারমুড্, যে মুহূর্তে ঐ আতা গাছটি চোখে পড়েছে, সেই থেকে একটি আতা পাবার জন্য মন আমার ব্যাকুল হয়েছে। এ ইচ্ছাকে আমি কিছুতেই থামাতে পারছি নে। যতই থামাতে যাই, ইচ্ছা ততই বেড়ে যায়। একটি

একটি আতা ফল না পেলে আমি মরে যাবো

ডায়ারমুড্ (পৃঃ ৫১)

আতা ফল না পেলে আমি মরে যাবো ডায়ারমুড্—মরে যাবো নিশ্চয়ই।

গ্রানিয়ার কথা শুনে ডায়ারমুড্ বলল—তুমি ভেবোনা গ্রানিয়া। সিয়ারভনকে বললে, সে একটা কেন, অনেকগুলি আতাই আমাদের দিয়ে দেবে।

গ্রানিয়াকে নানারূপ মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে, ডায়ারমুড্ আতা গাছটার কাছে গেল। দেখল গাছের মাথায় নীচের দিকে মাথা ঝুলিয়ে সিয়ারভন নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। ডায়ারমুড্ একবার ভাবল যে, সিয়ারভন তো ঘুমোচ্ছে, এই ফাঁকে গাছ থেকে দু-একটা আতা পেড়ে নিলে, সে জানতেও পারবে না, কিন্তু প্রতিজ্ঞার কথা মনে রেখে সে আর তা করল না। চীৎকার করে ডাকতে লাগল সিয়ারভনকে। ডায়ারমুডের ডাকাডাকিতে সিয়ারভনের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ায় সে ভীষণ রেগে গেল। তার কপালের মাঝখানের সেই চোখটা দিয়ে যেন আগুন বেরোতে লাগল। সিংহের মতো গর্জন করে সে বললো—কেরে বেটা? এতদূর সাহস যে এই অসময়ে আমার ঘুম ভাঙ্গাতে এলি।

ডায়ারমুড্, শান্ত স্বরেই উত্তর করল—রাগ কোরো না, সিয়ারভন। আমার কথা আগে শোন। তুমি তো ছিলে ঘুমিয়ে, ইচ্ছে করলেই এই ফাঁকে আমি যত খুশি আতা চুরি করতে পারতাম। কিন্তু তা করলে তোমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছি, তা ভঙ্গ হ'ত। তাই তোমায় জাগিয়েছি।

—তা কথা যখন দিয়েছিস, তার পরে আর কথা কি আছে? —কয়েকটি ফল আমার চাই। এইটুকু দয়া কর।—না, না, তা হবেনা। আমায় চটাস্‌নে। কেন মিছে প্রাণটা যাবে।

—দয়া কর সিয়ারভন, কয়েকটি আতা না হ'লেই নয়। ঐ ফল

খেতে রাজকন্যা গ্রানিয়ার এমনই সাধ হয়েছে যে, তা না খেতে পেলে হয়ত সে দুঃখে মরেই যাবে।

—গ্রানিয়া মরবে তাতে আমার কি? মরলেও এ ফল সে পাবে না। আমি দেবো না।

অনেক অনুনয়, বিনয়, কাকুতি-মিনতি করেও যখন কোন ফল হল না, ডায়ারমুডের ভীষণ রাগ হ'ল। সেও রাগত স্বরে বলল—সিয়ারভন, কয়েকটি ফল আমি নেবই। তাতে জীবনের পরোয়া আমি করি না।

ডায়ারমুডের কথা শুনে সিয়ারভন রাগে গর্জন করতে করতে ছুটে এল, হাতে গদা নিয়ে। ডায়ারমুডের মাথা লক্ষ্য ক'রে সে মারল এক গদার বাড়ি। কিন্তু সে আঘাত ডায়ারমুডের মাথায় লাগল না। কৌশলে সে তা এড়িয়ে গেল। ফলে টাল সামলাতে না পেরে সিয়ারভন গেল পড়ে। যেমনি পড়া, ডায়ারমুড্ তার বর্শাটাকে সজোরে চালিয়ে দিল সিয়ারভনের বুকে। আর এক নিমেষে সে সিয়ারভনের গদাটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারল তার মাথা লক্ষ্য করে। সিয়ারভনের বুক থেকে তাজা লাল রক্ত বেরিয়ে এল ফিনকি দিয়ে। তার মাথাটা একেবারে গুঁড়িয়ে গেল, দেহ থেকে প্রাণ এল বেরিয়ে।

ডায়ারমুড্ও ক্লান্ত হয়েছিল খুবই। কিন্তু তবু সে ছুটে গিয়ে মনের খুশিতে গ্রানিয়াকে বলল—আর তোমায় দুঃখ করতে হবে না গ্রানিয়া। আতা তুমি এবার যত খুশি খেতে পারবে, যত তোমার খুশি। কেউ আর বাধা দেবে না। সিয়ারভনকে চিরকালের মত আমি ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি।

সিয়ারভন মরেছে শুনে গ্রানিয়ার আনন্দের আর সীমা রইল না। দুজনে তখন আতা গাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়াল। ডায়ারমুড্ গাছে চড়ে অনেকগুলি আতা পেড়ে নিয়ে এল। ফল মুখে দিতেই গ্রানিয়ার রূপ যেন হাজার গুণ বেড়ে গেল। তার গালদুটি হল যেন দুটি গোলাপ-

ফুলের পাপড়ি—চোখ দুটি যেন হরিণ শিশুর চোখ—আর সোনার বরণ চুলগুলি উঠল আরও উজ্জ্বল হয়ে। গ্রানিয়া আবার ফিরে পেল মনের আনন্দ। কোমল কণ্ঠে সে ডায়ারমুড্‌কে বলল—তুমি এবার ঘুমোও ডায়ারমুড্, আমি তোমায় পাহারা দেব।—এই বলে সে গুনগুন করে এমন মিষ্টি সুরে গান গাইতে লাগল যে শুনতে শুনতে ডায়ারমুডের চোখের পাতা আপনা থেকেই বুজে এল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ডায়ারমুড্ সিয়ারভনকে মেরে ফেলেছে শুনে দেবতারা তার ওপর ভীষণ চটে গেলেন। তাঁদের আদেশেই সিয়ারভন আতা গাছের রক্ষণাবেক্ষণ করছিল। মানুষ ডায়ারমুডের অধিকার নেই তাকে মেরে ফেলবার। ডায়ারমুড্‌কে এজন্য অবশ্যই তাঁদের কাছ থেকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

ডায়ারমুড্‌কে শাস্তি অবশ্য শেষ পর্যন্ত পেতে হল না। দেবী এঙ্গাস অনেক বলে কয়ে অন্যান্য দেবতাদের শান্ত করলেন। তিনি ডায়ারমুডের এমনই প্রশংসা করলেন যে দেবতারা তাকে ক্ষমা তো করলেনই, গ্রানিয়াকে নিয়ে বনে থাকবারও অনুমতি দিলেন।

এখন বেশ শান্তিতে আর সুখেই তাদের দিন কাটতে লাগল। কিন্তু সে বেশী দিনের জন্য নয়। ফিন্ তাদের গুপ্তস্থানের খবর পেয়ে গেল, আর তক্ষুনি ছুটল তার দলবল নিয়ে তাদের ধরবার জন্য। এবার ফিন্ আর তার দলবল আগেকার মত হৈ-চৈ আর জাঁকজমক ক'রে এল না। এমন গোপনে তারা বনের ভিতর এসে পড়ল যে ডায়ারমুড্ আর গ্রানিয়া তা জানতেও পারল না। যখন জানতে পারল তখন পালাবার না আছে সময়—না আছে কোন উপায়। নিরুপায় হয়েই তারা শেষে সেই আতা গাছটায় উঠে ঘন ডালপালার মধ্যে নিজেদের লুকিয়ে ফেলল।

ফিন্ তাঁর লোকজনদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন—সকলে

সাবধান, এবার যেন আর শয়তান ডায়ারমুড্ আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে। নিশ্চয়ই সে বনের মধ্যে কোথাও আছে।—এই বলে তিনি বনটার চারদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি চালিয়ে নিলেন। তার পর কবি ওইসিনের দিকে চেয়ে বললেন—এস ওইসিন্, দুজনে দাবা খেলি। যদিও ডায়ারমুড্ ছাড়া কেউ আমাকে হারাতে পারে নি, তাহলেও খেলাটা তোমার বেশ ভালই জানা আছে। এস দুজনে ভাগ্য পরীক্ষা করি।

ওইসিন্ দাবা খেলার ছক নিয়ে এল। তারপর সেই আতা গাছটার তলায় দুজনে খেলতে বসে গেল। প্রথমদিকে ফিনেরই জেতবার মত হল। সে এমন কৌশলে ওইসিনের ঘুঁটিগুলোকে আটকে দিল যে ওইসিন্ একেবারে কোণঠাসা হ'য়ে পড়ল। একটিমাত্র চাল। ঐ চালটি দিতে পারলে, তবেই ওইসিন্ পরাজয়ের হাত এড়াতে পারে। কিন্তু কিছুতেই সে তা বুঝে উঠতে পারছে না। ডায়ারমুড্ ডালপালার ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল তাদের খেলা। সে দাবা খেলায় ওদের দুজনের চেয়েই ওস্তাদ। সে বুঝতে পারছিল ওইসিন্ কোথায় ভুল করছে। সে আর থাকতে পারল না। ফিস্ ফিস্ করে গ্রানিয়াকে বলল—আমি যদি ওইসিন্‌কে সাহায্য করতে পারতাম। গ্রানিয়া ডায়ারমুডের মুখ চেপে ধরল। তারপর তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল—চুপ, কথা বোলো না। ফিন্ যে তাহলে দেখে ফেলবে আমাদের। এমন চালটা ওইসিন্ ধরতে পারছে না দেখে, ডায়ারমুড্ আর কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারল না। সে গাছ থেকে একটা আতা ছিঁড়ে নিল। তারপর যে ঘুঁটিটা চাললে ওইসিন্ জিততে পারে সেই ঘুঁটিটার উপর ফেলে দিল। ওইসিনের চোখ খুলে গেল। সে বুঝতে পারল কোন্ ঘুঁটিটা চালতে হবে। পরাজয়ের হাত থেকে তখনকার মত সে বেঁচে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই

ফিন্ আবার তাকে কোণঠাসা করল। এবারও ডায়ারমুড্ আতা ছুঁড়ে তাকে জানিয়ে দিল কোন ঘুঁটিটা চালতে হবে।

এবার তুজনেই সমান সমান চলেছে। ফিন্ জিতবে কি ওইসিন্ জিতবে নিশ্চয় করে তা বলা যাচ্ছে না। ঠিক এমন সময় আর একটি আতা এসে পড়ল ওইসিনের ঘুঁটির উপর। এক চালেই বাজী মাৎ। ওইসিন্ জিতে গেল। ফিনের কিন্তু সন্দেহ হ'ল। গাছের ফল আপনা থেকে নীচে পড়ে এমনভাবে খেলার গতি ঘুরিয়ে দিতে পারে ? আর যদি মানুষেই ফেলে থাকে, তাহলে এমন নির্ভুল দাবার চাল ধরিয়ে দেওয়া এক ডায়ারমুড্ ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

ফিন্ ওইসিনকে বললেন—তুমি জিতেছ বটে, কিন্তু আমার মনে হয় ডায়ারমুড্ তোমায় সাহায্য করেছে।

—আপনি কি বলছেন, এখানে ডায়ারমুড্ কোথায়। অবাক হয়ে বলে ওইসিন্।

—আমি ঠিকই বলছি ওইসিন্। ডায়ারমুড্ নিশ্চয়ই এই আতা-গাছে লুকিয়ে আছে।—এই বলে ফিন্ একটু হাসলেন। তারপর আদেশের ভঙ্গিতে বললেন—ডায়ারমুড্, নেমে এস, লুকিয়ে থেকে আর লাভ নেই। গ্রানিয়া আকুল হ'য়ে বলল—চুপ, চুপ—কথা বোলো না।

কিন্তু ডায়ারমুড্ বলে উঠল—বিচারে আপনার ভুল কখনও হ'তে দেখি নি মহান্ ফিন্। আজও হয়নি। আপনি ঠিকই ধরেছেন। তবে আমিও আপনার সম্মুখীন হ'তে প্রস্তুত।

ডায়ারমুডের কথা শুনে ফিন্ রাগে কাঁপতে কাঁপতে আদেশ করলেন—সবাই মিলে গাছটাকে ঘিরে দাঁড়াও। শয়তান যেন কোনদিক দিয়ে পালাবার পথ না পায়।

ফিন্ নিজেই গাছটায় ওঠবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর বয়স হ'য়েছে অনেক। কিছুদূর উঠেই আর পারলেন না। তাঁকে নেমে

আসতে হ'ল। তারপর ফিন্নাদের মধ্যে থেকেই একজন গিয়ে উঠল সেই আতাগাছে। ফিন্নাদের মধ্যে এই লোকটাই ডায়ারমুড্‌কে ঘৃণা করত সকলের চেয়ে বেশী। কিন্তু তার কপাল মন্দ। গাছটার মাথা সে ছোঁবে ছোঁবে—এমন সময় ডায়ারমুড্ তার মাথায় ওপর থেকে এমন এক লাথি মারল যে, সে জ্ঞান হারিয়ে একেবারে মাটিতে পড়ে গেল, আর অল্পক্ষণের মধ্যেই মরে গেল।

তারপর পর পর আরও দুতিনজন চেষ্টা করল গাছে উঠে ডায়ারমুড্‌কে ধরতে, কিন্তু তাদের সকলের ভাগ্যেই ঘটল সেই একই পরিণাম—মৃত্যু। দেখে শুনে ফিন্ হতাশ হ'য়ে পড়লেন।

ডায়ারমুড্ নিজেই নেমে আসত। কিন্তু পাছে সে নেমে এলে কেউ গ্রানিয়াকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় এই ভয়েই সে এতক্ষণ নামে নি। সে মনে মনে ভাবছিল—দেবী এঙ্গাস যদি এখন এখানে থাকতেন! গ্রানিয়ার জন্য তাহলে ভাবতে হত না। সহসা তার চোখের সামনে দেবী এঙ্গাস আবির্ভূত হলেন! বললেন—আমি তোমাদের দুজনকেই নিয়ে যেতে এসেছি।

—দয়া করে গ্রানিয়াকে কোনও নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান, —ডায়ারমুড্ উত্তর দিল—আমি এখন যাব না। ফিনের সঙ্গে মুখোমুখি একটা বোঝাপড়া আমায় করতেই হবে।

—তাহলে আমরা ব্রু-না-বোসিতে গিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।—এই বলে প্রেমের দেবী এঙ্গাস গ্রানিয়াকে তাঁর মায়া চাদরে ঢেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

ডায়ারমুড্ নিশ্চিন্ত হ'য়ে নেমে এল গাছ থেকে। নির্ভয়ে ফিনের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল—হে মহান্ ফিন্, একদিন ছিল যখন আমি আমার জীবন দিয়েও আপনার সেবা করতে কুণ্ঠিত হইনি। আমার অপরাধ ক্ষমা করে যদি আপনি ইচ্ছে করেন, আমি আবার তেমনি আপনার সেবা করতে প্রস্তুত আছি।

—তোমায় ক্ষমা ! কক্ষনো নয়। চীৎকার করে ওঠে ফিন্—তোমার মত শয়তান ক্ষমার অযোগ্য। যতদিন আমার প্রতি তোমার অন্যায়ের প্রতিশোধ আমি না নিতে পারব, ততদিন আমি তোমায় হাঁফ ফেলবার অবকাশটুকু পর্যন্ত দেব না। কবি ওইসিন্, শক্তিমান গল এবং অন্যান্য সকলেই ফিনকে বুঝোবার চেষ্টা করল যে ডায়ারমুড্ এতদিন ধরে যে কঠিন দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করেছে, তাতেই তার অন্যায়ের যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। এখন তাকে ফিনের ক্ষমা করাই উচিত। তারা আরও জানাল যে এখনও যদি ফিন্ তার গোঁ ধরে বসে থাকেন, তাহলে তারা ডায়ারমুড্‌কেই সাহায্য করবে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ফিন্ শুনল না তাদের কথা ; চীৎকার করে বলল, 'তোমাদের কাউকেই আমার দরকার নেই। আমি একাই আমার শত্রুকে দেখে নেব।' এই বলে রক্তিম চোখে ফিন্ ডায়ারমুডের সম্মুখে সোজা হয়ে দাঁড়াল ; গম্ভীর স্বরে বলল—'ওরে শয়তান ডায়ারমুড্। যদি সাহস থাকে, তবে আয় দুজনেরই শক্তি পরীক্ষাটা হয়ে যাক আজ।'

ডায়ারমুড্ উত্তর দিল না। মৃদু হাসল মাত্র। পরমুহূর্তেই বর্শার উপর ভর দিয়ে সে শূন্যে দিল এক লাফ। সে ফিনের হাতের নাগালের মধ্যেই ছিল, এখন গিয়ে পড়ল তার থেকে প্রায় ত্রিশ হাত দূরে। বৃদ্ধ ফিন্ আর তার নাগাল পেলনা। ফিন্নার মধ্যে যারা তখনও ফিনের একান্ত অনুগত, তারা ডায়ারমুডের পিছু নেবার চেষ্টা করতেই কবি ওইসিন্ আর শক্তিমান গল তাদের বাধা দিল। দেখতে না দেখতে ডায়ারমুড্ আড়াল হ'য়ে গেল। ব্রু-না-বোসিতে গিয়ে সে দেখল, গ্রানিয়া সেখানে নিরাপদেই রয়েছে। দেবী এঙ্গাস সব বিষয়েই সুবন্দোবস্ত করে গিয়েছেন।

ডায়ারমুড্ আর গ্রানিয়া কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে, আবার বেরিয়ে পড়ল। এক জায়গায় বেশীদিন থাকা তাদের পক্ষে উচিত হবে না। কখন ফিন্ অতর্কিতে এসে তাদের আক্রমণ করবে কে জানে।

এমনিভাবে তারা প্রায় সমস্ত আয়ার্ল্যাণ্ডের এক বন থেকে আর এক বনে লুকিয়ে ফিরতে লাগল। শেষে ঘুরতে ঘুরতে তারা এসে উপস্থিত হ'ল সাগরতীরে একটা গুহার কাছে। গুহার মধ্যে থাকত এক বুড়ি।

অনেকদিন-অনেকরাত, না ঘুমিয়ে, না খেয়ে, ছুটে ছুটে তারা এখানে এসেছে। বড়ই ক্লান্ত তারা। ঘুমে তাদের চোখের পাতা বারবার বুজে আসছে। বুড়িকে ডেকে ডায়ারমুড্ বলল—তুমি দয়া করে আমাদের তোমার এই গুহার ভিতর একটু ঘুমোতে দাও। অনেকদিন ঘুমোতে পাই নি আমরা। বুড়ি জিজ্ঞেস করে—তোমরা কারা? অনেকদিন ঘুমোও নি কেন?—ডায়ারমুড্ বলল—শত্রু আমাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে।—বুড়ি শুধোয়—শত্রু! কে সে?—ডায়ারমুড্ বলে—ফিন্, মহান ফিন্।

এখন হয়েছে কি, না ঐ বুড়িই ফিন্‌কে তার ছেলেবেলায় লালন-পালন করেছে। বুড়ি তাই ফিন্‌কে খুব ভালোবাসত। সে মুখে ডায়ারমুড্ ও গ্রানিয়াকে খুব আদর দেখাল। যত্ন করে তাদের বিছানা পেতে দিল ঘুমোবার জন্য। বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই শ্রান্ত ক্লান্ত ডায়ারমুড্ ও গ্রানিয়া গভীর ঘুমে অচেতন হ'য়ে পড়ল। দুষ্টু বুড়ি তখন বেরিয়ে পড়ল ফিন্‌কে খবর দিতে। পথেই ফিনের সাথে বুড়ির দেখা হ'য়ে গেল। বুড়ি তাকে বলল সব কথা। শুনে ফিনের আনন্দ আর ধরে না। এবার সে ডায়ারমুড্‌কে উচিত শিক্ষা দেবে। সে ঠিক করল যে ঘুমন্ত অবস্থায়ই ডায়ারমুড্‌কে সে বেঁধে ফেলবে। আর যদি ফিন্ গুহায় পৌঁছাবার আগেই ডায়ারমুড্ ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তাহলেও আগের মত সে পালাতে পারবে না, কারণ গুহার মাত্র একটি মুখ।

ফিন্নারা একটু পিছিয়ে পড়েছিল। ফিন্ তাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সে বুড়িকে বলল—ধাই মা, তুমি ফিরে যাও।

যদি ওরা জেগে ওঠে, তাহলে মিষ্টি কথায় ওদের ভুলিয়ে রাখবে। আমি না পৌঁছোনো পর্যন্ত ওদের যেতে দেবে না কিছুতেই।—ফিনের কথা সে রাখবে জানিয়ে বুড়ি পা চালিয়ে দিল গুহার দিকে। গুহায় পৌঁছে, বুড়ি তো অবাক। ডায়ারমুড্ আর গ্রানিয়া কখন উঠে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

ভাল করে ঘুমোতে পেরে, ওরা আবার আগের মতই সুস্থ আর সবল বোধ করছিল। এখন ওরা আবার যেতে পারবে অনেক দূর। ওরা বুড়ির কাছে বিদায় চাইল। দুষ্টু বুড়ি তাড়াতাড়ি বলল—ওমা! সে কি কথা। তোমরা এসেছো আমার বাড়ীতে! তোমরা আমার অতিথি। না খেয়ে যাবে কি? আর এখন যাবেই বা কি করে। সাগরতীরে আমি থাকি। কোন্ মেঘের কি ফল আমার মত কে আর জানবে বল। এখনি বর্ষার প্রচণ্ড ধারা নামবে আর ধেয়ে আসবে ঝড়। আর দেরি নেই। এতক্ষণে বোধ হয় শুরু হয়ে গেছে। তোমরা বোসো। আমি দেখে আসছি।

বুড়ির যেন ওদের প্রতি কতই না দরদ—এমনি ভাব দেখিয়ে বুড়ি ছুটে গেল গুহার দরজায়। আবার তখনই ছুটে ফিরে এল। চোখ দুটো বড় করে বলল—যা বলেছি তাই। এই তো এত বয়স হল—এমন ঝড়বৃষ্টি দেখি নি জীবনে। সৃষ্টি বুঝি আজ শেষ হয়ে যায়। না বাছারা। তোমাদের এখন কিছুতেই বেরোতে দেব না।

এখন গুহার ভিতরটা ছিল গুহামুখ থেকে অনেক দূরে। বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে ভিতর থেকে তাই বোঝবার জো নেই। আর তাছাড়া বুড়ি এমন দরদ মিশিয়ে কথা বলছিল যে তার মনের কথা জানবারও কোনও উপায় ছিল না। ওরা বুড়িকে সন্দেহ করল না। ডায়ারমুড্ বলল—বেশ তাই হোক। বুড়ি, ওদের প্রতি তার মায়া যেন উপচে পড়ছে, এমনি ভাব দেখিয়ে আবার বলল—ঝড়বৃষ্টি একটু কমে এলেই

আমি তোমাদের জানাব। এই বলে বুড়ি চলে গেল। গুহামুখে গিয়ে সে বসে রইল—কখন ফিন্ আসে।

কিন্তু গ্রানিয়া মেয়ে। মেয়েদের ধরনধারণ সে ডায়ারমুডের চেয়ে ভাল বোঝে। বুড়ি যতই তাদের আদর আর মায়া দেখাক, তার কেমন সন্দেহ হল। বুড়ি শেষে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তো। গ্রানিয়া ভয় পেয়ে গেল। ডায়ারমুডের কানে কানে সে বলল—ডায়ারমুড্, বুড়িকে ভাল মনে হচ্ছে না আমার। ওর এই আদর-যত্নের পেছনে নিশ্চয়ই কোন কুমতলব লুকিয়ে আছে। চল আমরা এখনই পালিয়ে যাই।

পালাবার আর সময় হল না। ফিন্ তার লোকজন নিয়ে তখন গুহামুখে এসে পৌঁচেছে। ফিন্ চীৎকার করে বলতে লাগল—ওরে শয়তান ডায়ারমুড্, বেরিয়ে আয়। এবার তোর দিন ঘনিয়ে এসেছে। ঠিক এমনি সময়ে দেবী এঙ্গাস সোনালী রঙের উজ্জ্বল পোশাকে ভূষিত হয়ে ডায়ারমুড্ আর গ্রানিয়ার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর গায়ের জ্যোতিতে গুহার মধ্যিখানটা যেন পূর্ণিমার আলোয় ঝলমল করে উঠল। দেবীকে দেখে ডায়ারমুড্ আর গ্রানিয়ার সে কি আনন্দ! আর তাদের ভয় নেই। দেবী তখন ফিন্‌কে ডেকে কঠিন স্বরে বললেন—আমার আদেশ, শত্রুতা ছেড়ে দিয়ে মিটমাট ক'রে নাও ফিন্।

—শয়তানটা আমার ভাবী বধূকে বিয়ে করেছে। ওকে আমি কি করে ক্ষমা করতে পারি?—বিরক্ত হয়ে ফিন্ উত্তর দেয়।

—তুমি এতদিন এক সঙ্গে থেকেও ডায়ারমুড্‌কে চিনতে পারো নি।—ক্রুদ্ধ স্বরে দেবী বলতে লাগলেন।—ডায়ারমুড্ কখনও বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে পারে না। সে গ্রানিয়াকে বিয়ে করে নি। অত নীচ সে নয়। সে শুধু তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। তা না করে তার আর উপায়ও ছিল না কিছু।

এই কথা শুনে ফিনের মন নরম হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল ডায়ারমুডের কোনও দোষ নেই। তার নিজের ও ভাগ্যের দোষেই তাদের এই বিচ্ছেদ ঘটেছে। তিনি দুহাত বাড়িয়ে ডায়ারমুড্‌কে আলিঙ্গন করে বললেন—ডায়ারমুড্, ভাগ্যের দোষে আমি তোমার মত বন্ধুকে শত্রু মনে করেছিলাম। বিনা দোষে তোমায় আমি অনেক দুঃখ দিয়েছি। আমায় ক্ষমা কর।

—আপনিও আমায় ক্ষমা করুন, মহান ফিন্। —শান্ত স্বরে বলল ডায়ারমুড্। এতদিন পরে আবার ফিনের সঙ্গে মিলতে পেরে তার দুচোখ সজল হ'য়ে উঠল। তারপর দেবী এঙ্গাসের মধ্যস্থতায় ডায়ারমুডের সঙ্গে গ্রানিয়ার বিয়ে হয়ে গেল। ফিন্ আনন্দের সঙ্গেই এই বিয়েতে রাজী হলেন।

ডায়ারমুড্ আর গ্রানিয়ার অবশেষে সত্যিই সুখের দিন এল। অতীতের দুঃখজর্জর দিনের শত ব্যথা হাজার সুখে রঙীন হয়ে ফুটে উঠল তাদের জীবনে—রঙীন ফুলেরই মত।

[Hilda Hart-এর লেখা গল্প অবলম্বনে]

বিমাতার যাদু

—ফিনোলা, তুই এত শুক্‌নো মুখে ঘুরে বেড়াস কেন বোন, বল্‌তো ? তোর দিকে চাওয়া যায়না। কি এমন দুঃখ তোর, আমায় বল।—বড় ভাই এড্ ছোট বোন ফিনোলাকে জিজ্ঞেস করল। আদর করে তাকে কোলের কাছে টেনে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

চারটি ভাই বোন ওরা। এড্ সকলের বড়। তারপরই ফিনোলা। তারপর ছোট্ট আর দুটি ভাই—কিত্রা আর কণ্। চারটি ভাই বোন যেন এক প্রাণ। ওদের বাবা লার প্রদেশের একজন নামজাদা সর্দার। চারটি ভাই বোন এক বসন্ত-প্রভাতের উজ্জ্বল সুন্দর আলোয় খেলা করছিল ডারস্ত্রা হ্রদের তীরে। কিত্রা আর কণের সেকি স্ফূর্তি! কত রকমের খেলাই না খেলছে তারা দাদার সঙ্গে, আর হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। কিন্তু ফিনোলার যেন ভাল লাগছে না খেলা। সে একা শুধু ঘুরছে আনমনে, বিমর্ষ মুখে।

একসময়ে তাই ফিনোলাকে কাছে পেয়ে এড্ ঐ কথাগুলো বলল। ফিনোলা দাদার কোলের কাছে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল। কোন উত্তর দিল না। এডের মনও ছোট বোনের দুঃখে ব্যথায় ভরে গেল। কোথায় গেল ফিনোলার সেই হাসিখুশী মুখখানি! এড্ যেমনি অবাক হয়, তেমনি হয় ব্যথিত—আর তেমনি সে ভাবনায় পড়ে। ফিনোলাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে সে ব্যথিত স্বরে বলে—আমায় বল্‌বি নে বোন ?

ফিনোলা বুঝতে পারে, তার মলিন মুখ দেখে দাদার মনে খুবই কষ্ট হচ্ছে। সে এডের একখানা হাত নিজের হাতে জড়িয়ে নিয়ে, তার চোখে চোখ রেখে বলল—সকল সময়েই আমার বুকের মধ্যে

কেমন যেন করে দাদা! এই দেখ আমার বুকে হাত দিয়ে, কি রকম করছে বুকের ভিতর।—এই বলে ফিনোলা এডের হাতখানা নিজের বুকে চেপে ধরে।

—ভয়!—অবাক হয়ে বলে এড্—আমরা যার ছেলেমেয়ে, তিনি হলেন এদেশের একজন বিখ্যাত বীর। লার প্রদেশে তাঁকে ভয় না করে আর শ্রদ্ধা না করে এমন মানুষ একটিও নেই। আমাদের আবার কাকে ভয়?

ফিনোলা এডের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল—ভয় আর কাউকে নয় দাদা! ভয় আমাদের সৎমাকে। তিনি মুখে যত মিষ্টি কথা বলেন, ওপরে যত ভাল ব্যবহার করেন, অন্তরে ঠিক ততখানি হিংসাই পোষণ করেন আমাদের প্রতি। আমার মন আমাকে বলে—সৎমা আমাদের ভাল নয়। তাই কেবলই ভয়ে ভয়ে থাকি, কখন তিনি আমাদের কি অনিষ্ট করে বসেন। এড্ অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে। বলে—তুই ভুল বুঝেছিস্ ফিনোলা! সৎমা খারাপ হবেন কেন? কেনই বা তিনি আমাদের ক্ষতি করবেন?

—তুমি জান না দাদা, বাবা আমাদের এতটা ভালবাসেন, এ তার দু'চোখের বিষ।—করুণ চোখে চেয়ে ফিনোলা বলে—আমি ভুল বুঝি নি দাদা। আমি দেখেছি; অনেকবার দেখেছি।

—কি দেখেছিস্?

সৎমার চোখের চাউনি। তা দেখলে তোমারও বুক কেঁপে উঠবে। সে চাউনিতে যেন হিংসা ঝরে পড়ছে। কেউ কাছে থাকলে তিনি হাসি মুখে স্নেহের ভান করেন বটে, কিন্তু যখন দেখেন যে কেউ কাছে নেই, তখনই যেন হিংসায় তাঁর চোখ দুটো জ্বলে উঠে। আর স্বপ্নেও আমি প্রায়ই দেখতে পাই যে সৎমা যেন ভূত হয়ে আমাদের ধরতে আসছেন।

—রাতের স্বপ্নও যেমন স্বপ্ন, ভোরের সাথে সাথে মিথ্যে হয়ে যায়,

এও তোর সেই রকম দিনের স্বপ্ন—মিথ্যে ভাবনা। অকারণে অত মন খারাপ করিস নে। মনে কর্ তিনি ভাল, তাহলেই দেখবি ভয় চলে গেছে। এই বলে এড্ বোনের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। এমন সময় ওদের বাবা ওদের সৎমার হাত ধরে সেই পথে এলেন। তাঁদের দিকে চোখ পড়তেই এড্ বলল—ঐ দেখ্, বাবা আর সৎমা এই দিকেই আসছেন। বেশ, এখনি পরীক্ষা হয়ে যাবে, তোর কথা ঠিক কিনা।

ওদের সৎমার নাম আইভা। রাজা বড্‌বির পালিতা কন্যা। যেমন সুন্দরী তেমনি তার মুখে চোখে একটা আভিজাত্যের ছাপ। সবদিক দিয়েই আইভা লার প্রদেশের সর্দারের পত্নী হবার উপযুক্ত।

কাছে এসে সর্দার হাসিমুখে ছেলেমেয়েদের আদর করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন তারা হ্রদের জলে স্নান করবে কিনা। ওরা চারজনেই একসাথে বলে উঠল—হ্যাঁ, করব। আপনি আমাদের সাঁতার কাটা দেখবেন না ?

সর্দার হেসে উত্তর করলেন—আজ নয়। আজ নয়। আজ রাজা বড্‌বির সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।

—তাহলে আমাদেরও নিয়ে চলুন না সেখানে। ফিত্রা ও কণ্ দু'জনে বাবার দু'হাত ধরে বলে ওঠে।

—রাজার ওখানে গিয়ে তোমরা কি করবে! সর্দার হেসে ফিত্রা আর কণের থুতনি নেড়ে দিলেন। আইভার দিকে চেয়ে বললেন—যেন চারটি আধফোটা ফুল! নয়কি? দিন দিন কেমন সুন্দর হয়ে ওরা বাড়ছে! আমার এড্-তো আর দু'এক বছরেই মস্ত বড় একজন যোদ্ধা হয়ে দাঁড়াবে।—এই বলে সর্দার এডের দিকে তাকালেন প্রশংসার বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে।

আইভা তার স্বর কোমল ক'রে বলল—ওরা প্রকৃতই সুন্দর। কিন্তু ফিনোলার সুন্দর মুখখানা সর্বদাই বিষাদ-মলিন। দেখলে সত্যি

আমার কষ্ট হয়। আহা, ও যদি ওর ভাইদের মত হাসিখুশী হত তাহলে আমার না জানি কত আনন্দ হত!

ফিনোলা ও তার ভাইদের প্রতি যেন কতই স্নেহ আর ভালবাসা আইভার, এমনি ভাব দেখিয়ে সে ফিনোলাকে চুমো খেল। এড্ বিজয়ীর চোখে চাইল ফিনোলার দিকে। তার চোখ যেন বলতে চাইল—কেমন বলেছিলাম না, সৎমা আমাদের ভালবাসেন।

সর্দার তার ছেলেমেয়েদের খুবই ভালবাসতেন। তিনি চাইতেন যে তাঁর স্ত্রীও তাঁর অতি প্রিয় ছেলেমেয়েদের তাঁরই মত ভালবাসুন। আইভার এই স্নেহের ও ভালবাসার ভানকে সত্য মনে ক'রে তিনি খুশী হলেন। ফিনোলাকে বললেন—হ্যাঁ, ফিনোলা, তোমার বিমাতা ঠিকই বলেছেন। আমরা তোমাদের ভালবাসি। তোমাদের হাসি-মুখ দেখলে আমাদের আনন্দ হয়। অভাব তো আমাদের কিছুরই নেই। তবে কেন তুমি এমন ম্লান মুখে ঘুরে বেড়াবে? এই সুন্দর পৃথিবী দুঃখ করবার স্থান নয়। তোমরা হাসবে, খেলবে—আমরা তোমাদের দিকে চেয়ে সুখী হব। একটু থেমে সর্দার এবার সকলকে বললেন—যাক্, তোমাদের স্নান করার সময় হল। আমারও তাড়াতাড়ি যেতে হবে। এসো আইভা।

আইভা বলল—আমি না হয় থেকেই যাই, কি বল? ওরা স্ফূর্তি ক'রে সাঁতার কেটে স্নান করবে—দেখতে আমার খুব ভাল লাগবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সাঁতার কাটতে দেখলেই, জলের বুকে সাঁতারকাটা পাখীদের কথা মনে পড়ে—কি সুন্দর দেখায় ওদের! —সর্দার খুশী হয়েই রাজী হলেন। একলাই চলে গেলেন তিনি রাজার সঙ্গে দেখা করতে। অল্পক্ষণ পরেই আর তাঁকে দেখা গেল না।

সর্দার চোখের আড়াল হতেই ফিনোলার মনে হল—দিনের আলো যেন নিভে গেল। আর সত্য সত্যই এক টুকরো মেঘ এসে

সূর্যকে ঢেকে দিল। জোর বাতাস এসে হ্রদের দু'কিনারে ঝোপ-গুলিকে নাড়িয়ে দিতে লাগল। আইভা ওদের ডেকে বললেন —তোমরা যে যার স্নান করবার পোশাক নিয়ে এস।

আইভার বলার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য মেঘমুক্ত হয়ে আবার উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা নিয়ে আকাশে ফুটে উঠল। ভাইবোনেরাও প্রস্তুত হল জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য। আইভা হেসে বলল—আজ দেখব, কে তোমাদের মধ্যে সেরা সাঁতারু। তাকে একটি চমৎকার দামী উপহার আমি দেব। আর সকলকেও অবশ্য উপহার দেব, তবে যে যেমন সাঁতার কাটতে পারবে সে তেমনই উপহার পাবে। তিন ভাই আর এক বোন হ্রদের একেবারে কিনারে গিয়ে দাঁড়াল। এড্ ফিনোলার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল—কিরে! এখনও কি বিমাতাকে তোর খারাপ মনে হয়? করুণ চোখে চেয়ে ফিনোলা বলল—এখনও। তোমরাও সেটা বুঝবে, যখন আর সময় থাকবে না কিছু করবার, এ আমি বুঝতে পারছি।

এই সময় আইভার চোখে ফুটে উঠল এক হিংস্র চাউনি। সে মনে মনে বলতে লাগল—ওরা বেঁচে থাকতে আমার সুখ নেই। এই হ্রদের জল যদি ওদের আজ তলিয়ে নিয়ে যায় চিরদিনের মত! আবার সে এও ভাবে—চাকরগুলো যা ভীরু! নইলে কবেই ওদের মেরে ফেলতুম। তা যখন হল না, আজ এই সুযোগ, আমি ওদের যাদু করব। এই ভেবে আইভা চলে এল একেবারে হ্রদের কিনারে। চার ভাই বোন সাঁতার কেটে অনেকটা দূর গিয়ে পড়েছিল। আইভা তাদের ডেকে বলল—এইবার তোমাদের উপহার দেব। সাঁতার কেটে কে আগে আসতে পার দেখি।

এড্ আর ফিনোলা এল আগে। কিত্রা আর কণ একটু পিছনে। চারজনই যখন তার সামনে এসে দাঁড়াল, আইভা একখানা যাদুদণ্ড বের করে তাদের মাথায় ছোঁয়াল। তারপর ক্রূর হাসি হেসে বলল

দেখতে দেখতে চারটি ভাইবোন চারটি রাজহাঁস হয়ে গেল (পৃঃ ৬৭)

—এই তোমাদের পুরস্কার। দেখতে দেখতে চারটি ভাইবোন চারটি রাজহাঁস হয়ে গেল। বরফের মত সাদা চারটি রাজহাঁস। হতবুদ্ধি হয়ে তারা চারজোড়া করুণ চোখে তাকাতে লাগল তাদের বিমাতার দিকে।

—প্যাঁক, প্যাঁক—এ তুমি কি করলে আমাদের ? চারজনেই কাতর কণ্ঠে বলে ওঠে।

এখন হয়েছে কি, ওরা হাঁস হয়ে গেল বটে, কিন্তু ওদের ভাষা মানুষের ভাষাই রইল। শুধু কিছু বলবার আগে দু'তিন বার হাঁসের ডাক ডেকে নিতে হয় তাদের এই যা। ওরা মানুষের মতই কথা বলছে দেখে, আইভার প্রথমে একটু ভয় হয়েছিল, তবে বেশীক্ষণের জন্য নয়। সে বলল—মানুষের ভাষা তোদের যায় নি দেখছি। তা ভালই হল। আমি তোদের কি করেছি, তা ভাল করেই বুঝবি এখন। জলের দিকে চেয়ে দেখ্।—চার ভাইবোন মাথা নিচু করে জলের দিকে চাইল। জলের মধ্যে নিজেদের ছায়া দেখে দুঃখে তাদের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তারা আকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল—প্যাঁক, প্যাঁক—আমরা তো তোমার প্রতি কোন অন্যায় করিনি। দয়া কর, দয়া কর ছোট মা। আমাদের আবার মানুষ করে দাও।

আইভা বলল—তা আর হয় না।—সারা জীবনই কি হাঁস হয়ে থাকতে হবে আমাদের ?—করুণ স্বরে ফিনোলা জিজ্ঞেস করল। —আইভা কোন উত্তর দিল না। বিদ্রূপের হাসি হেসে ওদের দিকে তাকাল। তারপর বাড়ীর দিকে চলল। কিন্তু দু'এক পা না যেতেই ফিরে তাকিয়ে শেষে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে বলল—

সতীন-ছেলে, সতীন-মেয়ে
আজকে থেকে থাকবি হয়ে হাঁস,
সাগর-ঢেউয়ে কাটবি সাঁতার
নয়তো যেথা নাচছে সায়র জল ;—

দূর-দেউলের শঙ্খধ্বনি
সন্ধ্যাবেলা শুনতে যদি পাস
তবেই ফিরে মানুষ হবি
কাটবে আমার গোপন যাত্নর ফাঁস।

আর একটি কথাও না বলে আইভা চলে গেল।

কিত্রা আর কণ ঠিক বুঝতে পারছিল না, কি নিদারুণ দুর্ভাগ্য তারা বরণ করেছে। হাঁস হয়ে তারা ভাবছিল— বাঃ, বেশ মজা তো! ছিলুম মানুষ, হলুম হাঁস! কিন্তু বিমাতা শঙ্খধ্বনির কথা কি বল্লেন!

তারা ফিনোলাকে জিজ্ঞেস করল—দিদি, বিমাতা শঙ্খধ্বনির কথা কি বল্লেন?

—কি করে জানবো ভাই!—চিন্তিতভাবে ফিনোলা উত্তর দেয়।

এড্ করুণ স্বরে বলল—প্যাঁক, প্যাঁক,—তোর কথা যদি তখন শুনতুম ফিনোলা! বাবাকে বললে এ দশা আমাদের হত না।

ফিনোলা বলল—যা হবার তা তো হয়েছে। ভয় পেলে চলবে না দাদা! আমরা হাঁস হয়ে গেছি বটে, আমাদের ভাষা যায় নি। বাবা তো এই পথেই ফিরবেন। তাঁকে বিমাতার নিষ্ঠুরতার কথা বলতে হবে।

এড্ বলল—আয়, ততক্ষণ আমরা আমাদের দুঃখের কাহিনী গান করি। তারা গাইতে লাগল তাদের দুঃখের কাহিনী। হাঁসের মুখে মানুষের ভাষা শুনে চারদিক থেকে লোক এসে জড়ো হতে লাগল। সকলেই ব্যথিত মনে শুনতে লাগল চারটি হাঁসের করুণ কাহিনী।

এদিকে সর্দার রাজা বড্‌বির রাজপ্রাসাদ থেকে ফিরলেন। হাঁসদের গলার স্বর শুনেই তাঁর প্রাণাধিক ছেলেমেয়েদের তিনি চিনতে পারলেন। বাবাকে দেখে হাঁসগুলির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। তারা কেঁদে কেঁদে সব কথাই তাঁকে বলল। সর্দারের রাগ, দুঃখ আর ক্ষোভের সীমা রইল না। তিনি ছুটলেন বাড়ীর দিকে।

আইভাও সর্দারের অপেক্ষায়ই ছিল। সর্দার তার কাছে আসতেই যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে জিজ্ঞেস করল—এত দেরি হ'ল কেন? —সর্দার সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল—ছেলে-মেয়েগুলোকে কই দেখছি নে। এ সময়ে ওরা গেল কোথায়?

আইভা বলল—সে তো জানি নে! কখন যে তারা বেরিয়ে যায়, কখন আসে, আমাকে তো কিছুই বলে না। সর্দার স্ত্রীর একেবারে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখদুটো যেন আগুনের গোলার মত জ্বল্‌তে লাগল। ধীর অথচ স্পষ্ট স্বরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—সত্যি করে বল তো, তুমি জান না তারা কোথায়?

আইভা সর্দারের ব্যবহারে যেন কতই বিস্মিত হয়েছে, এমনিভাবে বলল—এ তুমি কি বলছ? অমন করে বলছ বা কেন? তোমার ছেলেমেয়েরা যখন তখন যেখানে খুশি যাবে, তাই জানি নে বলে আমার উপর চোখ রাঙাবে তুমি?

—এখনও লুকোবার চেষ্টা করছিস? ডাইনি, কি অপরাধ করেছিল ফুলের মত সুন্দর ঐ ছেলেমেয়েগুলো যে, ওদের হাঁস করে দিলি!

আইভা দেখল সর্দার সবই জেনেছে। আর লুকিয়ে কোন লাভ হবে না। সেও সমান তেজের সঙ্গে উত্তর দিল—কেন দেবো না? তোমার সমস্ত ভালোবাসা কেন ওরাই অধিকার করে থাকবে?

—ভালোবাসা! সর্দার যেন ফেটে পড়লেন রাগে—আমি তোকে কোনদিন ভালোবাসিনি? এখন বুঝতে পারছি, তুই এতদিন আমাকেও যাদু দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিলি। তোর মত শয়তানী আমার স্ত্রী হবার যোগ্য নয়।

ছেলেমেয়েদের চিন্তায় সর্দারের চোখে ঘুম এল না। তাদের দুর্দশার কথা ভেবে তিনি চোখের জলে ভাসতে লাগলেন সারারাত। পরদিন সকালবেলা উঠেই সর্দার আইভাকে একরকম জোর করেই

নিয়ে গেলেন রাজা বড্‌বির কাছে। সমস্ত ঘটনা তাঁকে বলে তাঁর কাছ থেকে তিনি ন্যায়বিচার প্রার্থনা করলেন।

সব শুনে রাজা বললেন—সর্দার তোমার জন্য আমি দুঃখিত। আর এই শয়তানীকে আমার পালিতা কন্যা ভাবতে আমার লজ্জারও শেষ নেই। কিন্তু ও নিজে যদি ওর যাদু ফিরিয়ে না নেয়, তবে আমার তো করবার আর কিছুই নেই।

—আমারও আর করবার কিছু নেই—আইভা বলল—যাদু করা সহজ, কিন্তু তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে, সে ক্ষমতা দেবতাদেরও নেই।

—শঙ্খধ্বনি শুনলে ওরা মুক্ত হবে—একথা তবে বললে কেন?

—আমি জানি না। অজান্তেই আমার মুখ থেকে ঐ কথাগুলি বেরিয়েছে। কেন বেরিয়েছে, কি ওর অর্থ, কিছুই আমি জানিনে। একটু থেমে আইভা আবার বলল—এমন অন্যায়ই বা কি করেছি? আমায় যদি কেউ যাদু করে হাঁস করে দেয়, কি আসে যায় আমার? বনের পশু, পাখী বা আর যা কিছু একটা হলেই হল যদি বেঁচে থাকতে পারি। শুধু দৈত্য আমি হতে চাই না।

রাজা বড্‌বি রাগে চীৎকার করে বলে উঠলেন—তবে তাই হ' শয়তানী। আর কিছুই তোকে জব্দ করতে পারবে না।—এই বলেই বড্‌বি তাঁর রাজদণ্ড দিয়ে আইভার মাথায় 'এক-দুই-তিন' বলে তিনটি আঘাত করলেন। আইভা বিকট চীৎকার করে মুহূর্তে একটা কদাকার দৈত্যে পরিণত হল। তার মানুষের দেহ আর সেই দেহের সৌন্দর্য্য নিমেষে মিলিয়ে গেল। সে করুণ চীৎকারে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেল।

আইভার শাস্তি হল বটে, কিন্তু সর্দার তাঁর প্রিয় ছেলেমেয়েদের ফিরে পেলেন না। হ্রদের তীরে এসে হাঁসরূপী ছেলেমেয়েদের দিকে চেয়ে চেয়ে তিনি চোখের জল ফেলতে লাগলেন শুধু।

ফিনোলা বলল—দুঃখ করবেন না বাবা! আমাদের এখন পাখীর দেহ হ'লেও আপনার তো জানা রইল আমরা আপনারই ছেলেমেয়ে। প্রতিদিনই আপনি এখানে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। আর যখন কোনই উপায় নেই, ঐটুকুই লাভ।

সর্দার আর কি করবেন। ডাইনীটা যে ওদের মুখের ভাষা নষ্ট করতে পারে নি, সেইজন্যই ভগবানকে তিনি ধন্যবাদ দিলেন। আর নিজেকেও তিনি প্রবোধ দিলেন এইবলে যে প্রতিদিন এসে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা তো তিনি বলতে পারবেন। তাঁর শুধু ভয়, কে কবে ওদের চিনতে না পেরে সাধারণ হাঁস ভেবে দূর থেকে তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলে। তাই তিনি আদেশ দিলেন যে কেউ আর কখনও হাঁস শিকার করতে পারবে না। এমনি করে অনেক দিন কেটে গেল। সর্দার প্রত্যহ দু'বেলা এসে তাঁর হাঁস ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলে মনের দুঃখ লাঘব করেন। ছেলেমেয়েদেরও তাঁকে দেখে কত আনন্দ! কত কথাই না বলে তারা। তাদের কথা যেন আর ফুরোতে চায় না।

কিন্তু এ সুখটুকুও বেশী দিন রইল না। একদিন রাতের বেলা উঠল ভীষণ ঝড়। ডারস্রার জল ফুলে গর্জে উঠল, দু কূল ভাসিয়ে তীব্র বেগে ছুটে চলল প্রবল বন্যার টানে। স্রোতের বেগ সামলাতে না পেরে হাঁস ছেলেমেয়েরাও ভেসে ভেসে গিয়ে পড়ল এক নদীর জলে। সেখান থেকেও আবার একেবারে এক অসীম সমুদ্রের বুকে।

সকালবেলা যখন ঝড় থেমে গেল, সূর্য এসে পূব আকাশে ছড়িয়ে দিল তার আলোর রশ্মি, তখন তারা বুঝতে পারল যে তারা সাগরে এসে পড়েছে। সাগরের বুকে এক-একটা সে কি আকাশ-ছোঁয়া ঢেউ। একটা একটা ঢেউ ছুটে আসে, আর তাদের মনে হয় এই বুঝি তাদের আছড়ে মারবে। এ কোন সাগরে, কোথায় এসে পড়ল তারা! কতদূরে, কোথায় সেই ডারস্রা হ্রদ! কিছুরই ঠিক পায় না তারা। মনে ভয় হয়, আর হয় দুঃখ। বাবাকে তারা আর

দেখতে পাবে না—বলতে পারবে না তাদের সুখদুঃখের কথা। তাদের চোখে জল এসে যায়।

এড্ ফিনোলাকে বলল—এত ঢেউয়ের মাঝে কি করে যে প্রাণ বাঁচাব, বুঝতে পারছি নে। —একমাত্র ভগবানই এখন আমাদের বাঁচাতে পারেন—ফিনোলার মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। সে বলল এস দাদা, চার ভাইবোনে মিলে তাঁকেই ডাকি।

এদিকে চোখের জলে ভেসে কিস্রা বলতে লাগল—যা ঠাণ্ডা, বেশীক্ষণ থাকলে জমে বরফ হয়ে যাব যে দিদি! আর বাবা হয়ত এসে বসে আছেন আমাদের জন্য। ডারস্ত্রার জলে ফিরে চল না।

—কি করে যাব ভাই! —ফিনোলার চোখেও জল এল—পথ যে চিনিনে। আর সে কতদূর তাই বা কে জানে! ফিনোলা নিজের পাখা মেলে ভাইদের তাতে ঢেকে নিয়ে গরম করবার চেষ্টা করে।

এইভাবে আবার তাদের দিন কাটতে থাকে সেই অসীম সমুদ্রের বুকে। দিনের বেলা তারা ঢেউয়ে ঢেউয়ে সাঁতার কাটে। রাতের বেলায়, জলের বুকে মাথা উঁচিয়ে আছে যে সব পাহাড়, তাদেরই একটার মাথায় উঠে তারা ঘুমায়। বালি আর নোনা জল খেয়ে ক্ষুধা মেটায় তারা। ফিনোলা সকলকে সান্ত্বনা দেয় যে বসন্ত এলেই ওরা আবার ফিরে যেতে পারবে নিজেদের দেশে—সেই ডারস্ত্রার জলে। কিন্তু শীতকাল যেন আর ফুরোতে চায় না। সময়ে সময়ে ওদের মনে হয়, না আর বুঝি ওরা বাঁচবে না। শীতের এই হিম ঠাণ্ডায় ওরা মরে যাবে। আর বুঝি ওরা দেখতে পাবে না ওদের জন্মভূমির মাটি।

দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। এল বসন্ত। ওদের মন আশায় নেচে উঠল—আবার ওরা দেখতে পাবে নিজেদের দেশ। দেখতে পাবে বাবাকে। কিন্তু সাগরের স্রোত যেন এক গোলক-ধাঁধা। প্রাণপণ চেষ্টা করেও ওরা তার আবর্তের বাইরে আসতে পারল না। বাধ্য হয়েই ওদের সাগরে থেকে যেতে হল।

মনের ত্বঃখে ওদের দিন কাটে। দিনের পর দিন কেটে যায়—বছর শেষ হয়ে নূতন বছর আসে—এমনি করে অনেক অনেক বছর ওদের কেটে গেল সাগরজলে। একদিন ফিনোলা আপন মনে সাঁতার কাটছিল। নিজের অজান্তেই সে কখন গভীর জলস্রোতের আবর্ত ছাড়িয়ে এসে পড়েছিল প্রায় তীরের কাছে। তীরের দিকে তাকিয়ে অনেকটা দূরে, সে খুব বড় একটা মন্দির দেখতে পেল। সে তার ভাইদের ডেকে মন্দিরটা দেখাল। ভাইয়েরা বলল—ওটা নিশ্চয়ই একটা তুর্গ বা রাজপ্রাসাদ। ফিনোলা বলল—আমার কিন্তু ওটাকে বসতবাড়ি বলে মনে হয় না। ঠিক এমন সময় ডিং ডং—ডিং ডং ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠল। বাতাসে ভেসে, সাগরের ঢেউ পেরিয়ে সে ধ্বনি এসে পেঁছোল ওদের কানে। ভাইবোনেরা মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগল সেই মধুর ধ্বনি। ফিনোলা বলল— দাদা, এ নিশ্চয়ই প্রার্থনা-মন্দির। এস না, একবার চেষ্টা করে দেখি তীরে উঠতে পারি কিনা। ফিনোলার কথা শেষ হতে না হতেই কণ বলে উঠল—দেখ, দেখ, কি অদ্ভুত! সাগরের স্রোত একেবারে থেমে গেছে!

সত্যিই সাগরের জলে আর স্রোত ছিল না। কখন যে তা থেমে গেছে, ওরা টেরই পায়নি। ফিনোলা বলল—দাদা, বোধ হয় ভগবান আমাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন, নইলে সাগরের স্রোত কখনও বন্ধ হয়! এস আমরা তীরে উঠি।—ভাইবোনেরা গিয়ে তীরে উঠল। বাড়ীটার কাছে গিয়ে দেখা গেল, ফিনোলা ঠিকই বলেছে। ওটা রাজপ্রাসাদ বা তুর্গ নয়—একটা প্রার্থনা-মন্দির। ওরা মন্দিরের তুয়ারে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা-গান গাইতে লাগল।

হাঁসের মুখে মানুষের কথা শুনে মন্দিরের পুরোহিত বেরিয়ে এলেন। ওরা তাঁকে ওদের ত্বঃখের সমস্ত কাহিনী বলল। পুরোহিত ওদের প্রত্যেকের মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিলেন। আবার ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠল। আরম্ভ হল প্রার্থনা-সঙ্গীত। পুরোহিত হাঁস ভাইবোনদের নিয়ে প্রার্থনায় বসলেন। প্রার্থনাশেষে সকলে অবাক হয়ে দেখল—চারটি হাঁস আর হাঁস নেই, তারা চারটি মানুষে পরিণত হয়েছে। কি সুন্দর ফুটফুটে চারটি ভাইবোন!

[আইরিশ রূপকথা]

টেলিসিন

ওয়েল্‌স্ দেশে এক ডাইনী থাকত। তার ছিল এক ছেলে—যেমনি কুৎসিৎ তেমনি বোকা। ডাইনীর সাধ ছিল তার ছেলে বড় হয়ে রাজা আর্থারের গোল টেবিলের নাইট হবে। কিন্তু ছেলের যা রূপ আর যা বুদ্ধি! ডাইনীর সাধ বুঝি আর পূর্ণ হয় না। ডাইনী বুড়ী বড় ভাবনায় পড়ে গেল। ভেবে-ভেবে, শেষে এক মতলব এল তার মাথায়। ছেলেকে যদি সে কোন যাদুর দ্বারা কোনদিন জ্ঞানী করে তুলতে পারে, তবে জ্ঞানের আলোয় তার দেহের কুরূপ ঢাকা পড়ে যাবে। তখন আর তার গোল টেবিলের নাইট হতে কোনও বাধা থাকবে না।

ডাইনী যতরাজ্যের যাদু আর মন্ত্রতন্ত্রের বই এনে জড়ো ক'রল তার ঘরে। তারপর খুব মন দিয়ে পড়তে লাগল—একখানার পর আর একখানা। পড়তে-পড়তে সে পেয়ে গেল এমন একটা ওষুধ, যা খাওয়া মাত্রই যে কেউ সর্ববিদ্যাবিশারদ হতে পারে। তবে ওষুধটি তৈরী করতে হাঙ্গামাও কম নয়। একটা খুব বড় কড়াইয়ের মধ্যে নানা রকমের গাছ-গাছড়া আর জল দিয়ে পুরো একটি বছর ও একটি দিন ধরে জ্বাল দিতে হবে। এমনভাবে জ্বাল দিতে হবে যে একটি বছর একটি দিনের শেষ মুহূর্তে কড়াইতে মাত্র তিন ফোঁটা জল থাকবে। তিন ফোঁটার বেশী থাকলেও হবে না, কম থাকলেও হবে না। তাছাড়া কোন সময়েই কড়াইয়ের জল একেবারে শুকিয়ে গেলে চলবে না। এমনিভাবে ঠিকঠাক যদি তৈরী করা যায়, তাহলে যে ঐ তিন ফোঁটা জল খাবে, সে হবে পৃথিবীর সবার সেরা জ্ঞানী।

ডাইনী বুড়ী ঝোপে-ঝাড়ে আগানে-বাগানে ঘুরে ঘুরে বইয়ের লেখামত অনেক গাছ-গাছড়া যোগাড় করে আনল। তারপর একটা

প্রকাণ্ড কড়াইয়ের মধ্যে জল আর ঐসব গাছ-গাছড়া দিয়ে চাপিয়ে দিল উনুনের উপর। কিন্তু মুশকিল বাধল। ডাইনী বুড়ী একা মানুষ। কাজকর্ম তার ঢের। দিনের পর দিন ঐ উনুনের পাশে বসে থাকে সে কি করে? এমন কাউকে চাই, যার কাজকর্ম তেমন কিছুই নেই—এক দু'বেলা দু'টি খাওয়া ছাড়া। কিন্তু যাকে তাকে তো আবার বিশ্বাসও করা যায় না। কি জানি, কখন জেনে ফেলবে ওষুধের গোপন গুণের কথা। সব যে তাহলে ভেস্তে যাবে। অথচ একজন লোক না হলেও নয়।

ডাইনী বুড়ীর বাড়ী থেকে কিছুটা দূরে থাকত একটি অন্ধ মানুষ। নাম তার মর্ডা। মর্ডা অন্ধ! তায় নিরীহ গোবেচারা মানুষ। সে যেমন কিছু দেখতে পায় না, তেমনি কোন বিষয়ে তার কোন কৌতূহলও নেই। ডাইনী বুড়ী মর্ডাকেই পছন্দ করল। মর্ডাকে ডেকে এনে সে বলল—দেখ মর্ডা, এই কড়াইয়ে একটি ওষুধ তৈরী হচ্ছে। ঠিক মত জ্বাল দিতে পারলে অনেক কঠিন কঠিন রোগ সেরে যাবে এতে। আমার কথামত যদি কড়াইটাকে তুমি পাহারা দিতে পার, তাহলে অনেক টাকা বকশিশ পাবে। ভাল মানুষ মর্ডা রাজী হল। কিন্তু পরদিনই, ডাইনী যখন খোঁজ নিতে এল, সে বলল—এত কাজ আমি পারবো না।

—কি বলছিস্?—ডাইনী রেগে বলে—এত কাজটা কোথায়? বসে বসে জলটা না শুকিয়ে যায় এই তো দেখবি শুধু।

—কি যে বল?—মর্ডা বলে—জলটাকে সব সময়ে না নাড়লে উবে যাবে না?

তুই একটা আস্ত গাধা।—চেঁচিয়ে ওঠে ডাইনী বুড়ী—সেটা বুঝিস্ই যদি, জলটা নাড়্তে পারিসনে?

—এতো ভাল কথা দেখি। উনুনে কাঠও ঠেল্বো, ওষুধও

নাড়বো ! একহাতে দু'কাজ ! সে আমি পারবো না। হয়, আর একজন চাই, নয় রইল তোমার ওষুধ।

ডাইনী দেখল মর্ডাকে রাগিয়ে লাভ নেই। তাই সে কিছুটা নরম হয়েই বলল—মর্ডা, বোকামি করিসনে। একটু এদিক ওদিক হলে ওষুধের সবগুণ নষ্ট হয়ে যাবে।

—তা আমি কি ক'রবো ? একসঙ্গে দুটো কাজ আমি পারবো না।

—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি লোক দেখছি।—বলে ডাইনী বুড়ী দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ভাবতে লাগলো, আর কাকে বিশ্বাস করে কাজে লাগান যায়। এমন সময় একটি ছোট ছেলে দু'হাতে তুড়ি দিয়ে, নাচের ভঙ্গীতে পা ফেলে ফেলে, গান গেয়ে এগিয়ে আসছিল। ছেলেটি গাইছিল—

ও বাতাস, কও কি কথা,
ও পাখী, গাও কি গান
বুঝিনে একটু কিছু—
তবুও নাচায় প্রাণ
ধিন, ধিন-তাতাধিন-তাধিন-তাধিন।
কুটিরে বসে বসে,
তটিনীর তীরে তীরে
যেথা ফুল স্বপন দেখে
যেথা বায় বইছে ধীরে
ধিন-ধিন-তাতাধিন-তাধিন-তাধিন।

কি সুন্দর ছেলেটি ! ডাইনী বুড়ী ডাকল—এই ছোঁড়া, এদিকে একবার আয় দেখি। ছেলেটি আড়চোখে একবার বুড়ীর দিকে চেয়ে, একটু মুচকি হাসল। তারপর আবার গান গাইতে গাইতে আর

নাচতে নাচতে ডাইনী বুড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। ডাইনী বুড়ী জিজ্ঞেস করল—তোর নাম কি? বাড়ী কোথায়? —ছেলেটি বলল—নাম টেলিসিন। বাড়ী কোথায় জানিনে।

নামটি আমার টেলিসিন
নেচে বেড়াই তাধিন-ধিন।
কোথাও নেই বাড়ী ঘর।
কেহ নয় আপন-পর।
গান গাই আর নেচে বেড়াই
যেথা মোর মন চলে, যাই।

—তোর বাপ, মা আছে?

—না।

—আর কেউ?

—কেউ না।

ডাইনী বুড়ী মনে মনে ভাবল—তিন কুলে ছেলেটার কেউ নেই। এই ঠিক লোক জুটেছে। সে ছেলেটিকে ভুলোবার জন্য বলল—বাঃ, তোর নামটিও বেশ, মুখখানিও সুন্দর। ছেলেটি হাসতে লাগল আর চারদিকে উঁকি মারতে লাগল। হঠাৎ তার চোখ গিয়ে পড়ল সেই প্রকাণ্ড কড়াইটার ওপর। সে জিজ্ঞেস করল—কড়াইটার ভিতর কি? ডাইনী বলল—একটা ওষুধ। দিনরাত ওটাকে নাড়তে হবে। তুই পারবি নাড়তে? যদি পারিস, অনেক টাকা বকশিশ দেবো। পুরো এক বছর, তার ওপর আরও একদিন, বসে বসে কেবল নাড়তে হবে। বুঝে দেখ্।

একটা প্রকাণ্ড কড়াই—তার মধ্যে তৈরী হচ্ছে ওষুধ—সেটাকে আবার নাড়তে হবে গোটা এক বছর, তার ওপর আরও একদিন। মজা তো মন্দ নয়। ছেলেটি কৌতুক বোধ করে। ভাবে, দেখাই যাক্ না। সে রাজী হয়ে যায়।

একরত্তি ছেলে—ওকে আর ভয় কি?—এই ভেবে ডাইনী বুড়ী হাল্‌কা মনে বেরিয়ে যায় নিজের কাজে। ছেলেটি বসে বসে একটা হাতা নিয়ে কড়াইয়ের ভিতর নাড়তে থাকে আর ফিক্ ফিক্ করে হাসে—এ যেন একটা ভারী মজা। ডাইনী বুড়ী প্রত্যহ একবার করে আসে। নূতন নূতন গাছ-গাছরা দেয় কড়াইয়ের মধ্যে। পরীক্ষা করে—ঠিক মত চলছে কিনা ওষুধ তৈরীর কাজ।

না, ঠিক মতই চলছে কাজ। মর্ডা বা ছেলেটা কেউই কাজে অবহেলা করছে না। উনুনও ঠিক মতই জ্বলছে—ওষুধও কড়াইয়ের ভিতর টগবগ করে ফুটছে।

এমনি করে একটি বছর কেটে গেল। আর একটি দিন বাকী। টেলিসিন বসে বসে হাতা দিয়ে ওষুধটা ঘেঁটে দিচ্ছিল। হঠাৎ হাতাটার একটা ধাক্কা লেগে তিন ফোঁটা ঔষধ তার ডান হাতের একটা আঙুলে এসে পড়ল। খুব গরম লাগাতে সে জিভ্ দিয়ে আঙুলটা বার বার চেটে নিতে লাগল। আঙুলটা চেটে নিতেই টেলিসিনের মনে হল একখানা পর্দা যেন তার চোখের সামনে থেকে সরে গেল। সে যেন এখন এমন অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছে আর বুঝতে পারছে যা এতদিন তার চোখের ও মনের আড়ালে থেকে গিয়েছিল।

টেলিসিন তো জানত না যে ডাইনী বুড়ী জ্ঞান-রস তৈরী করছিল। তাই সর্ববিদ্যাবিশারদ হয়ে সে প্রথমটা খুবই বিস্মিত হয়ে গেল। তারপর তার মনে ভয় দেখা দিল। তার বুঝতে বাকী রইল না যে ডাইনী বুড়ী তার ছেলেকে খাওয়াবার জন্যই এই জ্ঞান-রস তৈরী করছিল। কিন্তু দৈবক্রমে সে-ই তা খেয়ে ফেলেছে। কাজেই ডাইনী বুড়ী যে ভীষণ চটে যাবে, তাতেও তার মনে সন্দেহ রইল না। —নানান্ যাদু জানে ডাইনীরা। কিসে কি করে বসবে, ঠিক নেই। তাই আগে ভাগে পালিয়ে বাঁচা ছাড়া তার সামনে আর অন্য কোনও

পথ রইল না। টেলিসিন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তারপর ছুটতে লাগল প্রাণপণে যে দিকে দু'চোখ যায়।

এদিকে হল কি, জ্ঞান-রস বেরিয়ে আসায় কড়াইয়ের মধ্যে রইল একধরনের মারাত্মক বিষ। সেই বিষ উত্তপ্ত হয়ে একরকমের জোরালো বিষাক্ত গ্যাস তৈরী হল। আর সেই বিষাক্ত গ্যাসের চাপে ভীষণ শব্দ করে কড়াইটা গেল ফেটে। তারপর সে যা কাণ্ড! বাতাসের সঙ্গে সেই বিষ ছড়িয়ে পড়ল সারা গ্রামে। যার গায়ে তা লাগে, তারই গায়ের ভিতর জ্বালা করতে থাকে। গ্রামের লোক যন্ত্রণায় ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিল। কেউ কিছুই বুঝতে পারে না, কেউ কিছুই বলতে পারে না—কেন এমন হল। সবাই শুধু 'বাবা রে,' 'মা রে', 'গেলুম রে' করতে লাগল।

ডাইনী বুড়ী যখন ফিরে এল, কাণ্ড দেখে তার তো চক্ষুস্থির। সে রাগে, দুঃখে চেঁচাতে লাগল। শেষে অন্ধ মর্ডাকে দেখতে পেয়ে একখানা কাঠ নিয়ে তাকেই সে বেদম প্রহার দিতে আরম্ভ করল। ব্যথার জ্বালায় অস্থির হয়ে মর্ডা কাঁদতে কাঁদতে বলল,—আমায় কেন মারছো? আমি কি দোষ করলাম?

ডাইনী বুড়ী এতক্ষণ খেয়ালই করেনি যে টেলিসিন সেখানে নেই—পালিয়েছে। টেলিসিনকে দেখতে না পেয়ে তার সমস্ত রাগই গিয়ে পড়ল এবার তারই উপর। —ঐ দুষ্টু ছোঁড়াটাই যত অনিষ্টের গোড়া। ভেবেছে আমার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচবে। দেখাচ্ছি মজাটা। —এই বলে সে ছুটলো টেলিসিনের পিছু পিছু।

টেলিসিন এখন সর্ববিদ্যাবিশারদ। জ্ঞান-রস খেয়ে আপনা থেকেই তার সবকিছু শেখা হয়ে গেছে। সে যখন দেখল ডাইনী বুড়ী তাকে ধরে ফেলে প্রায়, অমনি সে মন্ত্র আওড়াল—

তুক্ তাক্—ফুক্ ফাঁক—ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর
টেলিসিন খরগোস, ছোট বহুদূর।

যেমনি মন্ত্র আওড়ান, টেলিসিন এক খরগোস হয়ে ছুটল তীরবেগে।

ডাইনী বুড়ীও কম যায় না। আর কম যাবেই বা কেন? সেও তো যাদু জানে। সেও মন্ত্র আওড়ায়—

পাতের এঁটো কাঁটাকুটো
চেটে চেটে খা
কুকুর হয়ে যা।

ডাইনী বুড়ী অমনি কুকুর হয়ে খরগোসকে করল ধাওয়া। কত মাঠের মাঝ দিয়ে, কত পাহাড়ের ওপর দিয়ে যে কুকুর খরগোসের পিছু ছুটল, তার ঠিক নেই।

ছুটতে ছুটতে খরগোস এসে পড়ল এক নদীর তীরে। সামনে নদী পিছনে কুকুর—খরগোস দেখল এবার আর রক্ষা নেই। তবুও যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। খরগোসরূপী টেলিসিন মন্ত্র আওড়ায়—

পাতা নড়ে, পাতা পড়ে—শীতের ন্যাড়া গাছ,
আমি হলুম মাছ।

খরগোস ঝুপ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাছ হয়ে জলে সাঁতার কাটতে লাগল। ডাইনীও অমনি মন্ত্র পড়ে কুকুর থেকে হয়ে গেল একেবারে উদ্‌বিড়াল। উদ্‌বিড়াল ছুটল মাছকে ধাওয়া করে। মাছ পাখী হয়ে উঠল গিয়ে আকাশে। উড়ে চলল শূন্যে অনেক উঁচু দিয়ে। উদ্‌বিড়ালও অমনি বাজপাখী হয়ে তার পিছু ধাওয়া করল।

কিন্তু কতক্ষণ আর এভাবে পারা যায়। পাখীরূপী ছোট্ট ছেলে টেলিসিন ছুটে ছুটে হয়রান হয়ে পড়েছে। আর বুঝি সে পারে না। বাজপাখীটা তার ধারালো ঠোঁটে বিকট হাঁ করে ছুটে আসছে। আর বড় জোর মিনিট খানেক। তার পরেই তাকে মুখের মধ্যে পুরে ধারালো দাঁতে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। সে দিশেহারা হয়ে, এক ধানের খামারে ঢুকে গেল। সেখানে পড়েছিল কতগুলি তুষ-

-ছাড়ান চাল। সেও চাল হয়ে ঐ চালগুলির সঙ্গে মিশে গেল। ভাবলো এবার সে নিরাপদ।

বাজপাখীরূপী ডাইনী বুড়ী দেখল যে ছেলেটা চালাক বটে। এবার তাকে চিনে বের করা সোজা হবে না। তবু সে হাল ছাড়ল না। মস্ত ঝুঁটিওয়ালা এক কালো মোরগ হয়ে সে পায়ের নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে দেখতে লাগল কোন চালটা টেলিসিন। চালরূপী টেলিসিন এবার বিপদ গণল। কট্ করে মোরগ যদি চালটাকে একবার দু'ভাগ করে দিতে পারে—ব্যস্, টেলিসিন শেষ হয়ে যাবে।

চালরূপী টেলিসিন কি করবে না করবে ঠিক করতে না পেরে, আবার সেই ছোট্ট ছেলে টেলিসিন হয়ে দাঁড়াল ডাইনী বুড়ীর সামনে। ডাইনী বুড়ীও নিজের রূপ ধরে বললে—আমার সাথে চালাকি? এবার টের পাবে মজাটা। —এই বলে সে টেলিসিনকে একটা থলের ভেতর পুরে, থলের মুখটা খুব শক্ত করে বেঁধে, থলেটা বয়ে নিয়ে এল সাগরের তীরে। তারপর সাগরের উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে থলেটাকে গায়ের জোরে ছুঁড়ে দিল জলের মধ্যে। সাগরের ঢেউগুলি আনন্দে গর্জন করতে করতে থলেটাকে ঠেলে নিয়ে গেল চোখের আড়ালে। আর ডাইনী বুড়ী রাগে গর গর করতে করতে ফিরে গেল নিজের কাজে।

—২—

এদিকে জল ঢুকে ঢুকে থলেটা ভারী হয়ে উঠল আর ধীরে ধীরে সেটা জলের মধ্যে তলিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু বাঁচা যার ভাগ্যে রয়েছে তাকে কে মারবে। টেলিসিনকে নিয়ে ভাসতে ভাসতে থলেটা যেখানে এসে তলিয়ে যাচ্ছিল, সে জায়গাটা ছিল সল্‌মন্ মাছের একটা আড্ডা—আর গুইডনো নামে এক জেলের মাছ ধরবার জায়গা। গুইডনোর একটি ছেলে ছিল। নাম তার এলফিন। এলফিনের আর সব কিছুই ভাল, কেবল অদৃষ্টটাই ছিল মন্দ। দেখতে সে সুন্দর, স্বাস্থ্য তার অটুট আর স্বভাবটিও নির্মল। কিন্তু যে কাজেই

সে হাত দেয়—সেই কাজেই একটা না একটা গোলমাল বেধে ওঠে। জেলে গুইডনোর তাই ভাবনার সীমা ছিল না যে, কি মূলধন নিয়ে সে তার ছেলেকে রোজগার স্থুরু করাবে।

এখন যেদিন ডাইনী বুড়ী টেলিসিনকে স্যগরের জলে ফেলে দিল, সেদিন ছিল 'মে ডে'। আর আর বছর দেখা গেছে যে, ঐদিন জাল ফেললে সল্‌মন্ মাছে ভর্তি হয়ে ওঠে জাল। তাই গুইডনো ভেবে রেখেছিল যে এবার ঐ দিনটিতে আর একবার সে এলফিনের ভাগ্য পরীক্ষা করবে। নিজে জাল না ফেলে ছেলেকে ফেলতে দেবে জাল। যদি অন্যান্য বছরের মত মাছ ওঠে, বোঝা যাবে যে জেলেগিরিতে হয়ত এলফিনের কপাল খুলবে।

এলফিন গিয়ে জাল ফেলল। কিন্তু হায়, একটি সল্‌মন্‌ও ধরা পড়ল না তার জালে। তার বদলে একটি মুখবাঁধা ভারী থলে উঠে এল তার জালে জড়িয়ে। আর এক জেলে দাঁড়িয়েছিল তার পাশে। সে দুঃখ করে বলল,—এলফিন, তোমার কপালটাই মন্দ। নইলে যে 'মে ডে'-র মাছ বেচে তোমার বাবা এত পয়সা করল—সেই 'মে ডে'-তেই তোমার জালে কিনা একটি মাছও পড়ল না।

জালে একটি মাছ পড়েনি দেখে এলফিনও মন-মরা হয়ে গিয়েছিল। থলেটা দেখে অবশ্য তার একটু আশা হল। কে জানে কি আছে থলেটার মধ্যে। এই থলেটার ভিতর যা আছে, তাই যে তাকে বড়লোক করে দেবে না, তা-ই বা কে বলতে পারে। তাড়াতাড়ি তাই সে থলের মুখটা খুলে ফেলল। টাকাও না, পয়সাও না—থলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একরত্তি এক ছোট্ট ছেলে—মুখ ভরা তার হাসি। স্থন্দর ছেলেটিকে দেখে এলফিন তার সমস্ত দুঃখ ভুলে গেল। পাশের জেলেকে বলল—দেখ দেখ, কি রত্ন আমি পেয়েছি। তারপর ছেলেটির দিকে চেয়ে সে বলল—তোমার নাম কি খোকা? থলের ভেতর তুমি এলেই বা কি করে?—ছেলেটি একটি কথাও

বলল না। শুধু হাসতে লাগল এলফিনের দিকে চেয়ে। পাশের জেলেটি এবার বিদ্রূপ করে বলল—তোমার কপাল-দোষেই বোধ হয় এ জায়গায় মাছধরা তোমাদের উঠে গেল এলফিন। তোমার যখন ছোঁয়াচ লেগেছে, আর কি এখানে মাছ পড়বে ?—এলফিন শুধু উত্তর দিল—যা হবার তা হবেই। তারপর ছোট ছেলেটিকে ডেকে সে বলল—ওগো ছেলে, চলে এসো।

এলফিন ছেলেটিকে ঘোড়ার পিঠে তারই পাশে বসিয়ে চলল তাদের বাড়ীর দিকে। ছোট ছেলেটির কষ্ট হবে ভেবে ঘোড়াটাকে সে জোরে ছুটতে দিল না। যেতে যেতে সে ভাবতে লাগল—আমি বাস্তবিকই দুর্ভাগা, নইলে কে ভাবতে পেরেছিল যে 'মে ডে'তে এমনি শূন্য জাল উঠে আসবে—একটি মাছও পড়বে না জালে। এমন সময় ছেলেটি মৃদু হেসে ছড়া কাটল—

সুন্দর এলফিন, দুঃখ কি ভাই ?
সুখী হও তাই নিয়ে, যা আছে তোমার—
হা হুতাশ মিছে, তাতে কোন লাভ নাই,
কেহ নাহি জানে কিসে ভাল হবে কার।

ছড়া শুনে এলফিন তো অবাক। এতটুকু ছেলে এমন সুন্দর ছড়া কাটতে পারে ! বিস্মিত হয়ে সে শুধোয়—তুমি কি ভাই মানুষ, না দেবশিশু ?—ছেলেটি তেমনি হেসেই জবাব দেয়—আমি মানুষ। আমার নাম টেলিসিন। তারপর কি করে থলের ভেতর সে আটকা পড়েছিল সমস্তই এলফিনকে বলল। এর পর আবার সে ছড়া কাটল—

অথৈ-পাথার জলের মাঝে
মরণ হতে জীবন দিলে ভাই
ছোট্ট আমি—শিশু কবি,—
মাছের দুঃখ, ভুলবে সবই
দুঃখ-বিপদ-আঁধার রাতে
জ্বালব বাতি, হদিস যদি পাই।

এলফিন হু'চোখে বিস্ময় নিয়ে চেয়ে থাকে টেলিসিনের দিকে। টেলিসিন তার হুঃখের দিনে, বিপদের দিনে, আলো জ্বেলে পথ দেখাবে! এতটুকু ছেলে! কিছুক্ষণ সে যেন আর কথাই বলতে পারে না। শেষে নিজেকে সে সামলে নিয়ে বলে—এতটুকু ছেলে তুমি টেলিসিন, আমার কি কাজে তুমি লাগবে ভাই?—টেলিসিন বলল, কেন আমি হ'ব তোমার কবি।—এলফিন্ হো-হো করে হেসে উঠল। বলল—আমার মত ভাগ্যহীনের কবি থাকে না টেলিসিন। কবিরা গান করেন রাজারাজড়াদের দরবারে।—টেলিসিন কোন উত্তর দিল না। আপন মনে সে গান গেয়ে চলল। মিষ্টি আর শান্ত সে গানের সুর থেকে এলফিনের প্রাণে যেন সান্ত্বনা ঝরে ঝরে পড়তে লাগল। এলফিন তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল সে গান।

তারা যখন এলফিনদের বাড়ীতে এসে পৌছোল, এলফিনের বাবা জিজ্ঞেস করলেন এলফিনকে—জাল ফেলেছিলে?

—হ্যাঁ।

—কত মাছ উঠল?

—একটিও না। কিন্তু আমি মাছের চেয়ে অনেক মূল্যবান একটি রত্ন পেয়েছি বাবা। একটি শিশু! সে হবে আমার কবি। এই বলে এলফিন টেলিসিনকে দেখিয়ে দিল। গুইডনো হতাশ কণ্ঠে বলল—তোর দেখছি, বুদ্ধিশুদ্ধিও লোপ পেয়েছে। মাছের চেয়ে জেলের ছেলের কাছে কবি হল বেশী! —তুমি দেখে নিও বুড়ো, মাছের চেয়ে কবি বেশী কিনা। —হেসে বলল ছোট্ট ছেলে টেলিসিন। —এ্যাঁ! কথা বলতে তো বেশ শিখেছ দেখছি! গুইডনো বলল। —হ্যাঁ, তুমি প্রশ্ন করতে যতটা ওস্তাদ আমি উত্তর দিতে তার চেয়ে অনেক বেশী ওস্তাদ।—এই বলে টেলিসিন আবার এমন একটি গান গাইল যে গুইডনো একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। সে স্বীকার না করে পারল না যে মাছের চেয়ে সত্যিই এই কবির দাম অনেক

বেশী। সেদিন থেকে টেলিসিন এলফিনদের বাড়ীতেই রয়ে গেল। এলফিনের অদৃষ্ট যেন উল্টে যেতে লাগল দিনের পর দিন। এখন সে যাতেই হাত দেয়, তাতেই যেন সোনা ফলতে থাকে।

কয়েক মাস পরে একটি ঘটনা ঘটল। ম্যালান নামে এক ক্ষমতাশালী রাজা ক্রিস্‌মাস্‌ ডে-তে তার প্রাসাদে এক ভোজের আয়োজন করলেন। এলফিনও স্থান পেল ঐ ভোজে নিমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকায়। রাজারাজড়াদের ভোজসভায় তার নিমন্ত্রণ এই প্রথম। নিমন্ত্রণ পেয়ে সে তো মহা খুসী। আহ্লাদে আটখানা হয়ে সে টেলিসিনকে জড়িয়ে ধরে বলল—তুমিই আমার ভাগ্যদেবতা, আমার শিশু কবি।—টেলিসিন বলল—হতে পারি। কিন্তু সাবধান এলফিন, রাজাকে যেন চটিয়ে দিও না কোন কারণে।

এলফিন মৃদু হেসে বলল—না, না, রাজাকে চটাতে যাব কেন ?—এই বলে সে তার ঘোড়ায় চড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল রাজপ্রাসাদের দিকে, আর অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজপ্রাসাদে পৌঁছে গেল।

ভোজের শেষে রাজদরবারের কবিগণ মধুর সঙ্গীতে রাজার গুণগান ক'রে নিমন্ত্রিত অতিথিদের মনোরঞ্জন করলেন। এই কবিদের শিক্ষা ও দক্ষতা সম্বন্ধে রাজা ম্যালানের মনে একটা গর্ব ছিল। তিনি অতিথিদের সম্বোধন করে বললেন—আপনারা বোধ হয় সকলেই একমত যে এই কবিগণ জগতে অতুলনীয়। সকলেই একবাক্যে রাজার কথায় সায় দিল। একা এলফিনই সায় দিতে পারল না। সে যেন একটু উত্তেজিত হয়েই বলল—রাজার কথার প্রতিবাদ একমাত্র রাজারই করা শোভা পায়। কিন্তু তবু আমাকে বলতেই হবে যে, আমার একটি কবি আছে যে এদের চেয়ে অনেক গুণে গুণী।—এলফিনের কথা শুনে রাজার ভীষণ রাগ হল। তিনি এলফিনকে তখনই বন্দী করে কারাগারে নিয়ে যাবার হুকুম দিলেন। রাজার হুকুম পেয়ে প্রহরী এসে বেশ মোটা আর শক্ত শিকল দিয়ে এলফিনের হাত পা বেঁধে ফেলল ; তারপর তাকে নিয়ে গেল কারাগারে।

কারাগারে বন্দী হয়ে এলফিন চোখের জলে ভেসে ভাবতে লাগল—আহা! টেলিসিন যদি পাশে থাকত, সে গান গেয়ে আমায় সান্ত্বনা দিত।

এদিকে সময়মত এলফিনকে ফিরতে না দেখে তার বাড়ীর সকলেই খুব ভাবনার পড়ে গেল। কি হল এলফিনের? কেন সে আসছে না?—এখন টেলিসিনের তো সব বিদ্যাই জানা। সে গুনে দেখল, এলফিন বন্দী হয়েছে। রাজা তাকে আটকে রেখেছেন কারাগারে। সে গুইডনোকে বলল—আপনি ভাববেন না। আমি এলফিনকে এখনই ছাড়িয়ে নিয়ে আসছি।

টেলিসিন আর দেরি না করে তখনই চলল রাজবাড়ীতে। রাজ-কবিরা দরবারে পৌঁছোবার অনেক আগেই সে পৌঁছে গেল সেখানে। দরবারে ঢোকবার দরজার এক কোণ ঘেঁসে সে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক একজন ক'রে কবি ঢুকতে লাগলেন দরবারে। তাঁদের ঢোকবার সময়ে প্রত্যেকের কানের কাছে মুখ নিয়ে টেলিসিন একরকম অদ্ভুত শব্দ করতে লাগল। কবিরা টেলিসিনকে দেখতে পেলেন বটে, কিন্তু ছোট্ট ছেলে দেখে তাকে আমলই দিলেন না।

রাজা সিংহাসনে বসেছেন। মন্ত্রী, সেনাপতিরা, সব বসেছেন তাঁর চারপাশে। কবিরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমেই তাঁদের গান হবে। তারপর সুরু হবে দরবারের অন্যান্য কাজ। কিন্তু একি! কবিরা যতই গাইবার চেষ্টা করেন, কিছুতেই টেলিসিনের সেই অদ্ভুত শব্দ ছাড়া আর কিছুই তাঁরা উচ্চারণ করে উঠতে পারেন না। বার বারই তাঁরা গাইবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রত্যেকবার সেই অদ্ভুত শব্দই শুধু বেরোল তাঁদের মুখ থেকে। কবিরা লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করে রইলেন। এবার তাঁরা বুঝতে পারলেন যে ছোট্ট হলেও ছেলেটা একেবারে ছেলেমানুষ নয়। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—তোমাদের আজ হল কি? যদি গান

আমি জেলের ছেলে এলফিনের কবি। নাম টেলিসিন। (পৃঃ ৮৭)

গাইতেই না পারবে, আমার সামনে থেকে তাহলে দূর হয়ে যাও! রাজার তিরস্কারে কবিরা আরও লজ্জিত হলেন। কবিদের মধ্যে যিনি প্রধান, তিনি তখন ধীরে ধীরে, তাদের দরবারে ঢোকবার সময় যা ঘটেছে তাই বললেন। তখন রাজার আদেশে টেলিসিনকে রাজার সামনে নিয়ে আসা হল।

রাজা শুধোলেন—তুমি কে? নাম কি তোমার?

—আমি জেলের ছেলে এলফিনের কবি। নাম টেলিসিন।

রাজা বললেন,—ও তুমিই সেই বিখ্যাত কবি। একটা শিশু—তোমার সঙ্গে করতে হবে আমার এই সব সুদক্ষ কবিদের তুলনা! রাজার কথার ভঙ্গীতে তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা ফুটে উঠল! তিনি আরও বলে উঠলেন—বেশ বেশ গাও না খোকা, দেখি একবার, কেমন; তুমি গাইতে পার।

মৃদু হেসে টেলিসিন গান ধরল—কি সুন্দর সে গানের পদগুলি! কি মিষ্টি সে গানের সুর! আর সবার উপরে কি যেন আছে সে গানে, যা শোক, দুঃখ ভুলিয়ে দেয়—তাপিত মনে আনে সান্ত্বনা, আর মনকে নিয়ে যায় কোন্ এক আনন্দের স্বর্গলোকে।

রাজা আর তাঁর পাত্রমিত্রগণ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু রাজা এত সহজে তাঁর কবিদের হার মেনে নিতে চাইলেন না। তিনি আবার তাঁদের আদেশ দিলেন গান গাইতে। তাঁরা চেষ্টা করলেন, কিন্তু এবারও তাঁদের মুখ থেকে ঐ অদ্ভুত শব্দ ছাড়া আর কিছুই বেরোল না। টেলিসিন বলল—মহারাজ, আমিই ওদের যাদু করেছি। এলফিনকে মুক্তি দিলেই, আমি ওঁদের মুক্তি দেব। রাজা ভীষণ চটে গেলেন, একটা এতটুকু ছেলে কিনা তাকে ভয় দেখিয়ে কাজ করাতে চায়। তিনি বললেন—এলফিনকে তো ছাড়বই না, তোকেও আর ঘরে ফিরতে দোব না।

হেসে টেলিসিন উত্তর দিল—সে জন্য আর ভয় কি? কিন্তু

আমিও সহজে ছাড়ব না, মনে রাখবেন। এই বলে সে একটি গান আরম্ভ করল—

ঝুম্-ঝুম্,-ঝম্-ঝম্,-ঝুম্-ঝুম্, ঝুম্
নাম্ শিলা-বৃষ্টি
ডুবিয়ে দে সৃষ্টি
ভাঙ, ভাঙ বোকাদের ঘুম।
কোথা তুই ঝোড়ো হাওয়া, আয় ধেয়ে আয়
মড়্-মড়্, কড়্-কড়্
ভেঙ্গে দেরে বাড়ী ঘর
লাগিয়ে দে প্রলয়ের ধূম।

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হল সেকি ঝড় আর শিলা-বৃষ্টি! পৃথিবী বুঝি রসাতলে যায়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এক একটা শিলা-খণ্ড ছুটে আসে—আর আঘাতে আঘাতে ফাটিয়ে দিয়ে যায় রাজপ্রাসাদের দেয়াল আর ছাত; ছুটে আসে ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপ্টা, সমস্ত রাজপ্রাসাদটাকেই ছুলিয়ে দিয়ে পৃথিবী থেকে তাকে যেন আল্‌গা করে দিতে চায়। রাজা দেখলেন কিছুক্ষণ ধরে এমনিধারা প্রলয় চললে আর রক্ষে থাকবে না, সকলকেই মরতে হবে। তিনি পাগলের মত চিৎকার করে বললেন—কে আছিস্, শীগ্‌গীর্ এলফিনকে ছেড়ে দে।

এলফিন মুক্তি পেল। সে এসে জড়িয়ে ধরল টেলিসিনকে। তার হু'চোখ ভরা আনন্দ আর কৃতজ্ঞতা। রাজাও স্বীকার করলেন যে এলফিন ঠিকই বলেছিল। টেলিসিনের সমতুল্য কবি মেলা ভার। রাজা তাকে সভাকবি করে নিতে চাইলেন। সে রাজী হল।

রাজাকে নমস্কার জানিয়ে ছুই বন্ধু ঘোড়ায় চড়ে ফিরে চলল বাড়ীর পথে। পথে যেতে যেতে টেলিসিন বলল—আর একটি উপকার তোমার আমি করব বন্ধু।—এলফিন শুধোল—কি?—টেলিসিন বলল—আমরা

বাড়ী পৌঁছোবার কিছু আগে একটা জায়গায় আমাদের ঘোড়াটা হোঁচট খাবে। জায়গাটা চিনে রাখবে। কাল সকালে এসে জায়গাটা খুঁড়তে হবে।— এলফিন শুধোয়—সেখানে কি আছে? —টেলিসিন বলল—কি আছে, সে দেখতেই পাবে কাল। আজ আর কিছু বলব না। তাহলে সব পণ্ড হয়ে যাবে।

টেলিসিনের কথাই ফলল। ঐ এলফিনদের বাড়ী দেখা যাচ্ছে, এমন সময় ছুটন্ত ঘোড়াটা হোঁচট খেল্। এলফিন ঘোড়া থেকে নেমে জায়গাটায় একটা চিহ্ন দিয়ে রাখল। পরের দিন এসে জায়গাটা খুঁড়ে ফেলে সে তো অবাক। এ যে সেই আরব্যোপন্যাসের চল্লিশ দস্যুর গুপ্ত ধনাগার! সোনা, রূপো, মণি, মুক্তো, হীরে, জহরতে একেবারে ঝল্‌মল্ ঝল্‌মল্ করছে। টেলিসিন তার সঙ্গেই ছিল। সে তাকে বলল—বন্ধু, আমার জীবন বাঁচিয়েছ; খাবার, পরবার সব কিছু যুগিয়েছো এতদিন। তাছাড়া সবার উপরে আমায় তুমি ভালবেসেছ। তোমার ঋণ কখনও শোধ হবার নয়। তবু বন্ধুর এই সামান্য উপহার গ্রহণ কর।

সেই সামান্য উপহারেই কিন্তু এলফিন হল কোটিপতি। তার আর কোন দুঃখই রইল না। আর টেলিসিন? সে হল জগদ্‌বিখ্যাত কবি।

গল্প হল শেষ
খোকাখুকুর মন ছুটে যা
রূপকথারই দেশ।

[একটি আইরিশ গল্পের ভাবানুবাদ]

—*—